কনে দেখা আলো

মনোতোষ সরকার

ক্যালকাটা বুক ক্লাব
৮৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

বুক ক্লাবের পক্ষ থেকে সুখেন্দু পাল,
কর্তৃক ২।৩বি, দেব লেন হইতে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ শিল্পী
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

দাম : দুই টাকা

মুদ্রাকর :—
কালীশঙ্কর বাক্‌চি এম্, এস-সি,
(পি, এম্, বাক্‌চি এণ্ড কোং লিঃ)
ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেস,
৩৮এ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

আজকের সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক শাখার নয়, শিকড়ের। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের নয়, লঘুকরণের। তাই সামাজিক মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের পথ সুগম করা সাহিত্যিকের অন্যতম দায়িত্ব। এই দায়িত্ব-বোধের প্রেরণাই আমার সাহিত্য সৃষ্টির উৎস। এই বই এর গল্পগুলি ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গল্প গুলির রচনাকাল ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১।

বন্ধুবর শচীন ভট্টাচার্য ও বান্ধবী করবী রায় এর সাহায্য না পেলে এই বই প্রকাশ সম্ভবপর হত না। এই বইএর গল্পগুলি এরাই নির্বাচন করেছেন। প্রুফ সংশোধনের নির্ভুলতার কৃতিত্বও এদের। এদের মধুময় প্রীতিই আমার এই বই প্রকাশের প্রেরণা।

প্রকাশক সুখেন্দু পাল সুপ্রকাশকের দায়িত্ব পালন করে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

কলিকাতা

আশ্বিন ১৩৫৮ মনোতোষ সরকার

বহ্নিমান কথাশিল্পী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ও

শক্তিমান রেখাশিল্পী

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

কে

কনে দেখা আলো

প্রাণ যায় যাক

ঘুণ

ব্যতিক্রম

বোবা কান্না

প্রতিরোধ

পতাকা

দাগ

তোমার আমার সবার জন্য

কাক কোকিল

লেখকের অন্যান্য বই

হলদে দুপুর

করবী রায় (যন্ত্রস্থ)

সিঁথিতে অনেক সিঁদুর (যন্ত্রস্থ)

কনে দেখার আলো

ঠিক আপত্তি নয়, কন্যাপক্ষ একটু গররাজি ছিল বাড়ীতে মেয়ে দেখাতে। একটু টালবাহানা করে সময় নিচ্ছিল আরকি। অবশ্য গররাজি হবার কারণ যে না দেখিয়েছিল তা নয়।

সবে দেশ ছেড়ে যথাসর্বস্ব খুইয়ে কলকাতা সহরে এসে পড়েছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে। শেয়ালদা ষ্টেসন থেকে সোজা কোন পরিচিত আত্মীয়ের বাড়ী তারপর সেখান থেকে একটু ভদ্র বসতিতে ডেরা বাঁধা। ঠিকমত গুছিয়ে বসতে পারেনি এখনো। চুন, বালি খসা দেওয়ালের মতন কেমন বিশৃঙ্খলা চারদিকে। মাদুর আর কালো তেলচিটে বালিশ আর তার ছেঁড়া ওয়াড়। তারচেয়ে আরো আগোছালো ছেলেমেয়েগুলো। ধূলো বালি ছড়িয়ে কাগজ ছিঁড়ে খেলছে এখানে সেখানে—

তার চেয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের লনে বা বোটানিকসে, নিদেন পক্ষে বাড়ীর কাছে পরেশনাথের মন্দির দেখার অজুহাতে—আজকাল তো মেয়ে দেখার আর দেখানোর নতুন রেওয়াজ হয়েছে। ভালই হয়েছে বলতে হবে—একগাদা লোকজন নিয়ে কারো বাড়ী চড়াও করে মেয়ে দেখা—বলির পাঁঠার মতন কাঁপতে কাঁপতে কাপড়ের পুঁটুলি এসে বসবে কাছে। আর চারপাশে দশজনের

কৌতুহলী দৃষ্টি। তারপর বয়স্কদের কেউ প্রশ্ন করবে, রাঁধতে জানে কিনা, শেলাই ফোঁড়াই হাতে কেমন আসে, কোন পর্যন্ত পড়েছে এমন কি বাংলায় ইংরেজীতে নাম লিখিয়ে তবে ছাড়বে। ইউনিভার্সিটির মেয়েরা পর্যন্ত রেহাই পাবে না। আর মেয়েরা এলেত কথাই নেই, তাকে হাঁটিয়ে, বসিয়ে, চুল খুলিয়ে পর্যন্ত দেখবে।

মেয়ের বাড়ীর লোকেরা কৃতার্থ হবে। হাত কচলাতে কচলাতে বলবে মেয়ের রং একটু কালো বটে, তবে কাজে কর্মে দেখতে হবে না। সংসার ঠিক চালিয়ে নিতে পারবে। নিজের মেয়ে বলে বলছি না—সেবার ওদের কলেজে গভর্ণর এসে ওর গানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। কাগজে লিখেছিল পর্যন্ত—

এবার এপক্ষ একটু টলল : কাগজে লিখেছিল?

—তবে আর কি বলছি, মা পুঁটু এদের একখানা গান শুনিয়ে দাও তো—

পুঁটুর অবস্থা তখন কাহিল। পাশের বাড়ী থেকে চেয়ে আনা কিম্বা মায়ের ছেলে বেলাকার কেনা বেসুরো হারমোনিয়ামে কুণ্ঠিত আঙ্গুল চালনা আর মুখস্ত করা কোন আধুনিক গানের সুর তোলার ব্যর্থ প্রচেষ্টা কিম্বা মীরার ভজন। দু-এক লাইনের মধ্যে যেটা বেশী এবং স্পষ্ট শোনা যায় সেই লাইনটা—"মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর"। বুড়োরা ফরমাস করেন একখানা কীর্ত্তন হোক। এবার মেয়ে পক্ষ থেকে আপত্তি ওঠে : আজকের মত ওকে মাপ করতে হবে, ব্যাচারী একেবারে ঘাবড়ে গেছে। আপনাদের বাড়ীতে স্থান দিলে কত গান শুনতে চান দেখব। এখন একটু মিষ্টিমুখ করতে হবে যৎকিঞ্চিৎ আর কি! তাতে অবশ্য দুই পক্ষ কাহিল হয়ে পড়েন একপক্ষ অর্থ ব্যয় ভারে আর একপক্ষ প্রচুর ভূরিভোজনে।

পরে খবর জানাব বলে বিদায় নিয়ে আসা নিঃশব্দে।

তার চেয়ে এ অনেক ভাল করেছে। আজকাল আগে থেকে ঠিকঠাক করে দুপক্ষ বেড়াতে এল কোন নির্দিষ্ট জায়গায়। তারপর আলাপ করে আনন্দের মধ্যে নতুন করে পরিচয়।

তাতে একটা লাইফ আছে। পায়ের তলায় ঘাস সবুজ আর নরম আর মখমলের মতন পুরু। দূরে দু-একটা গাছ ঝাকড়া মাথা নিয়ে বিজয়ীর মত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। তার তলায় বা এক পাশে বিলম্বিত ছায়া। দূরে দুএকটা লোক হাঁটছে। ঘাসের উপর তাদের ছায়া গুলো কাঁপছে বিকেলের পড়ন্ত আলোয়। সঙ্গে যারা ছিলেন এতক্ষণ আশেপাশে কোথায় ছিটকে পড়েছেন চলতে চলতে। অনেকটা ইচ্ছে করেই বোধ হয়, বুঝতে কষ্ট হয় না কারোর। চারদিকে নির্জনতা। কাছে আছে শুধু কোন অচেনা মেয়ে, যার সঙ্গে কোন কথা হয়নি, আলাপ হয়নি এমন কি দেখা হয়নি পর্যন্ত। লজ্জায় একটু নুয়ে পড়েছে সামনের দিকে। গালের রং অস্পষ্ট ফিকে গোলাপী। আঁচল যার কাঁপছে। দুলছে পিঠের লম্বা বেণী। চিকচিক্ করছে কানের নতুন ডিজাইনের পাথরটা। ভাবতেও অদ্ভুত লাগে ব্যোমকেশের। রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সারা শরীর। একটা অচেনা চুলের গন্ধ নাকের কাছে উদ্বেল হয়ে ওঠে। জিভ চাটে ব্যোমকেশ কিন্তু—

এতদিন পরে সে সব কথা পুরনো হয়ে গেছে সকলের কাছে। আগের সেই পুরনো কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা। নিজের সামান্য গাফিলতিতেই অযথা দেরী হয়ে গেল আড়াই মাস। এখন আর এক মুহূর্তও দেরী করতে রাজি নয়। এক মুহূর্তও নয়। চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিল এ সপ্তাহের মধ্যে দেখতে যাবে আর অযথা দেরী করে কোন লাভ নেই। আপত্তি থাকলে জানাতে লিখেছিল দুএক দিনের মধ্যে।

ওরা যে আপত্তি করেনি তা নয়। বলেছে: বুঝলেন না সবে দেশ

থেকে আসা হল, এখনও ভাল করে স্থির হয়ে বসতে পারিনি। আগোছালো হয়ে আছে। আপনাকে কোথায় নিয়ে যাব কোথায় বা একটু বসাব তার চেয়ে বাইরে কোথাও বেড়াতে বেড়াতে—আগের বারের মতন কোন জায়গায়। তবে একটু দেরী করতে হবে, মানে কয়েক দিনের মধ্যে জানাব।

কিন্তু এই একটু দেরী বা অপেক্ষা করার কথায় ভীষণ আপত্তি তুলেছে ব্যোমকেশ। পকেট থেকে সিগারেট বার করে, গম্ভীর মুখে রিং ছেড়েছে কয়েকটা। তারপর একটু সূক্ষ্ম বিদ্রূপ করে বলেছে: কেন, হাতে কোন পক্ষ আছে না কি? তবে অবশ্য—লম্বা ড্যাস টেনে গেছে।

এই দেরী করার অর্থ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়ে গেছে এতদিনে। ছবি দেখে মেয়ে পছন্দ করে কথাবার্তা চালাতে চালাতে দর বাড়াবার জন্য একটু চাপ দিতে গেছে। কয়েকদিন ইচ্ছে করেই খোঁজ খবর নেয় নি, দেয় নি। তারপর এক দিন হয়ত খোঁজ পেয়েছে—সে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। আবার কেউ কেউ চিঠির উত্তর পর্যন্ত দেয়নি। এমনি হাত ফসকে গেছে কত ভাল ভাল মেয়ে।

অবশ্য কোন বারই ভাবতে পারেনি তার মত স্বাস্থ্য যে কোন মেয়ের কাম্য না হতে পারে। তার ওপর সরকারী চাকুরে। আজকালকার দিনে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের তলায় নিরুদ্বেগে জীবন কাটানো—কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাল ভাল মেয়ে হাতছাড়া হয়ে গেছে। এবার আর ঠকতে চায় না তাই কোন মতে!

কোটের বোতাম খুলতে খুলতে জিগ্যেস করেছে: ছেলে কী করে ওপক্ষের?

ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকান অবাক চোখে: কোন ছেলে, কাদের কথা বলছেন?

—ওই যে আপনার যাদের সঙ্গে এখন কথাবার্তা চলছে। কী করে সে? চাকরী? পার্মানেন্ট? কোথায়?

আমতা আমতা করেন ভদ্রলোক। কেমন নির্বুদ্ধিতায় ছোপানো মুখ, মুখের চামড়া: আমি ঠিক মানে বুঝতে পারছি না। চিন্তায় বিনিদ্র রাত্রি যাপনের ক্লান্তিতে কোচকানো মুখের চামড়া। কেমন বুনো বুনো আর ক্লান্ত।

সরকারী চাকুরে ব্যোমকেশ। কথার মারপ্যাচ এতদিনে আয়ত্ত করেছে। মুহূর্তেই কথা পালটায় সুরে ধরণে: আমি বলছিলাম কি, সংসারে ত বুড়ো মা—তার ওপর সরকারের চাকুরী করতে আজ এখানে আছি কালকে হুকুম হলে অন্যখানে যেতে হবে। আরে মশাই এই করেই তো বিয়ের সময় পেলাম না।—হাসে ব্যোমকেশ। ইচ্ছে করেই সোনাবাঁধান দাঁতগুলো একটু বেশী কোরেই বার করে।

ভদ্রলোকের নজরে পড়ে কিনা বলা যায় না। ভদ্রলোক তেমনি ব্যাকুল চোখে তাকান। পরে বলেন: একটু সময় চাইছিলাম, ব্যাপারটা আর কিছু নয়—মেয়েটার, মানে আমার নাতনি—যাকে দেখতে যাবার কথা, আমার নাতনি হয়। বিকেল বেলা ফিরল মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে। বলল: বাস থেকে পড়ে গিয়ে হঠাৎ চোট লেগেছে মাথায়—সে ঘা-টা এখনো ভাল কোরে শুকোয়নি। তার উপর ওর বুড়ো বাবা ব্লাড্‌প্রেসারের রুগী। ভালই ছিল এদ্দিন—হঠাৎ সেদিন মাথা ঘুরে পড়ে গেল। তার পর থেকে কম্‌প্লিট লেফ্‌ট সাইড প্যারালিসিস হয়ে গেছে। কি বিপদ বলুনত, তাই—

হাতের সিগারেটের ছাই ক্রমশঃ বড় হয়। ব্যোমকেশের টানবার উৎসাহ আর থাক না। এ কোন্ দুঃসহ ব্যথার পাণ্ডুলিপি খুলে ধরেছেন ভদ্রলোক? অভিভূত হয়ে পড়ছে সে। সরকারী চাকরী করে—যা

মাইনে পায় তারও বেশী পায় উপরি। তার ওপর আজ এটা কাল সেটা পাঠায় লোকে। দয়া করে গ্রহণ করে সে।

দেশের মন্ত্রীরা বিবৃতি দিচ্ছেন: দুর্যোগ তারা কাটিয়ে উঠছেন, উঠেছেন. আর উঠবেন বাপুজির আশীর্বাদে। বিশ্বাস আছে ব্যোমকেশের। বিশ্বাস ও করে যোগ্যতর ব্যক্তিদের হাতে দেশের শাসন ভার এসেছে। যথাসাধ্য সাহায্য করে ব্যোমকেশ। সাহায্য করবেও। দেশের শত্রুদের সম্বন্ধে আরো কঠোর, আরো নির্মম হবে সে। তা না হলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে।

—আপনি যা বলছেন তাতে অবশ্য আমার বলার—মানে আপনাদের ওপর বেশী দোষ দেওয়াটা আমার বিবেকের ঠিক সমর্থন পাচ্ছে না। তবে আমার মনে হয় এ সময় আমারই আপনাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান উচিৎ। যদি কিছু সামান্যতম উপকার করতে পারি তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

ভদ্রলোক আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েন। হাত দুটো জড়িয়ে ধরেন ব্যোমকেশের: যদি যাও একবার—আর কথা বেরুতে চায়না, চোখের জলে আটকে যায়।

নিজের ভাষায় নিজেই অবাক হয়ে যায় ব্যোমকেশ। বাংলায় কোন কালে তেমন দখল ছিল না। আর সাহিত্যের বাতিকও ছিল না। তবে এ ভগবানের দয়া। মনে মনে ভগবানকে প্রণাম করে ব্যোমকেশ। পকেটে হাত দিয়ে একটা সিগারেট বার করে। ধরাতে গিয়ে মনে পড়ে মেয়ের দাদু সামনে বসে। আবার সিগারেটটা নামিয়ে রাখে। আস্তে বলে: ভদ্র লোকের আর ছেলে পুলে নেই? আত্মীয়তার সুরে আরো ঘেঁসে আসে কাছে।

ফ্যাকাশে চোখের তারায় মৃত্যুর হিম স্পর্শের আমেজে হঠাৎ যেন

বিদ্যুতের চমক জাগে। ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বলেন ছেলে নেই, মানে আছে—আছে একটা নয় দু'টো—

—কি করে ? মানে চাকরী বাকরী, না পড়ছে এখনো ?

প্রথমে হঠাৎ কিছুই বলেন না, পরে বলেন ভদ্রলোক : একটাত জেলে পুলিশের গুলিতে মরতে বেঁচে গেছে ! সেদিন দুটো হাত কেটে বাদ দিয়েছে। সাতটা বুলেট লেগেছিল। তবু বেঁচে গেছে। কিন্তু সংসারকে মারল।' চিকিৎসায় অনেক টাকা ধার বর্জ করতে হয়। এখন আছে—আধ পাগলার মতন কোন মতে বেঁচে—

—আর একজন ? অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল ব্যোমকেশ।

—আর একজন ! —হঠাৎ চমক ভাঙার মত বললেন ভদ্রলোক : আর একজন—দেড়বছর ধরে তার কোন খোঁজ খবর নেই।

ঠিক মত বুঝতে পারে না ব্যোমকেশ। ঠিক পরিষ্কার হয় না। সংসারে একজন বুড়ো মানুষ ব্লাডপ্রেসারের রুগী। একজন সাতটা বুলেট খেয়ে কোন মতে বেঁচে মরে আছে। আর একজনের খবর নেই দু'বছর। আর সংসারটা বাঁচবার জন্য তবুও মাথা তুলতে চাইছে। মাথাটা—ব্যোমকেশের মাথাটা কেমন করে ওঠে। ধোঁয়া ধোঁয়া লাগে। আবার পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট বার করতে যায়। কিন্তু পরমুহূর্তে মনে পড়ে সামনে বসে থাকা বুড়ো ভদ্রলোকের কথা। সিগারেটটা আবার পকেটে রেখে দেয়।

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে বলেন : তবু মেয়েটা চালাচ্ছিল সংসারটা কোন মতে তাতো শুনলেই—

শক্ত ঘাড়ের ওপর শক্ত বোঝা এসে পড়ে—কথাটা যেন কোথায় শুনেছিল ব্যোমকেশ। একবার নিজের ঘাড়ের ওপর হাত বুলিয়ে নিল। 'হাত দিয়ে অনুভব করল ব্যোমকেশ গাড়ীটানা মোষের শক্ত ঘাড়ের মতন : আপনি কিছু ভাববেন না, আমি নিশ্চয়ই যাব। দু-এক

দিনের মধ্যেই। নিজের মনে একবার হিসেব করে নেয় ব্যোমকেশ। তারপর বলে: কালতো আর হয়ে উঠবে না, তবে পরশু নিশ্চয়ই যাব।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। বিড বিড করে কী যেন বললেন। তারপর টুক্ টুক্ করে বেরিয়ে গেলেন।

আজকে যেন নতুন জীবন পেয়েছে ব্যোমকেশ। তাকে এগিয়ে দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার পর্যন্ত করতে ভুলল না।

ঠিকানা খুঁজে বার করতে অবশ্য কষ্টই হল ব্যোমকেশের। ডান পাশের গলিতে ঢুকে তাকে বাঁয়ে ফেলে এদিক ওদিক করে তবে খুঁজে পেল। একটা পুরনো বাড়ীতে অনেক লোকজন। সবে এসে বাসা বেঁধেছে এখানে।

কড়া নাড়ল ব্যোমকেশ। জামার হাতাটা তুলে একবার ঘড়িটা দেখে রুমাল দিয়ে মুখটা একবার মুছল ব্যোমকেশ। চারদিকে কি বিশ্রী গন্ধ। গা গুলিয়ে আসছে। দরজার পাশে পড়ে আছে স্তূপীকৃত ময়লা, ছাঁই পাশ আর আবর্জনা। আর দেওয়ালে কাঁচা ঘুঁটে। আর একবার কড়া নাড়ল ব্যোমকেশ।

অনেকক্ষণ পরে একজন লোক এলো, সন্দিগ্ধ চোখে একবার তাকালে তার দিকে: কারে খোঁজেন?—কথায় দেশী টান।

ততক্ষণে সিগারেট বার করেছে ব্যোমকেশ। দেশলাইটা ধরালো কায়দা করে। ক্যাপ্‌স্টেনের একটা মৃদু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ব্যোমকেশ বলে: দোতলার বিশ্বেশ্বর বাবুকে—নারাণগঞ্জের—যার মেয়ে ট্রাম থেকে পড়ে গেছে—

লোকটা হঠাৎ কিছু বলতে চায় না। পরে বলে: ক্যান্ দরকারটা কি কন্‌তো?

এবার একটু চটে যায় ব্যোমকেশ: দরকার আপনার সংগে নয়—

তাদের কেউ থাকেত ডেকে দিন নয়ত আমাকে সেখানে যাবার পথটা দেখিয়ে দিন।—ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছিল ব্যোমকেশ।

লোকটা কিছু না বলেই চলে গেল।

একবার আকাশের দিকে তাকাল ব্যোমকেশ। গাঢ় নীল আর উজ্জল। অনেকক্ষণ স্থির চোখে তাকান যায় না। চিক্ চিক্ করছে বেলা শেষের সোনালী রোদ। গাছের পাতা কাঁপছে হাওয়ায়। বাড়ীর কার্নিশে পড়ন্ত রোদের আভাষ। মনে পড়ে গেল, বিকেলে—আর একটু পরে বেলা শেষের রোদ মিলিয়ে যাবে।

একটু পরে একটী ছোট মেয়ে এসে ডাকল ব্যোমকেশকে। নিয়ে গেল। পকেট থেকে রুমাল বার করল ব্যোমকেশ। সেণ্টের মৃদু গন্ধে আমোদিত হয়ে পড়ল চারদিক। মেয়েটা একবার তাকাল ব্যোমকেশের দিকে। তারপর আবার চলতে লাগল। অনেকগুলো ঘরের সামনে দিয়ে বারাণ্ডা পেরিয়ে তবে দোতলার সিঁড়ি। একবার একটুখানি থমকে দাঁড়াল ব্যোমকেশ। তারপর ওপরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সুরু করল। ওপরে এসে যে ঘরে বসলো ব্যোমকেশ সেখানা আসলে ঘর নয়, বারাণ্ডার একটা অংশ। হোগলার বেড়া দিয়ে ঘিরে নেওয়া হয়েছে। একখানা তক্তোপোষের ওপর আধময়লা সুজনির ওপর একখানা বালিশ। ময়লা ওয়াড়ে অস্পষ্ট রুক্ষতা। একখানা কাঠের প্যাকিং বাক্সের ওপরে দুচারখানা খাতা আর বই। একটা টিনের কৌটো—তার ওপরে গলা মোম জমে উঠেছে অনেকখানি আর অর্ধেক মোম এখনো দাঁড়িয়ে আছে। একটা দেশলাই। চুলের রিবন, কয়েকটা কাঁচের চুড়ির ভাঙা টুকরো, দড়িতে কয়েকটা মেয়েদের কাপড় আর জামা। কয়েক মিনিট চুপ চাপ বসে রইল ব্যোমকেশ। তারপর হাত বাড়িয়ে প্যাকিং বাক্সের ওপর থেকে তুলে নিল কয়েকখানা ইংরেজী বই—মার্কস আর এ্যাঙ্গেলসের, তারপর

গোর্কির কালেকসন একখানা, পরের খানা রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি। প্রত্যেক বইখানার ওপর লেখা নীতা সোম। স্পষ্ট ঝরঝরে লেখা। ঠিকমত বুঝতে পারছে না, ঘরে কেউ নেই—আর দু'একবার দেখছে সামনে দিয়ে কে যেন হেঁটে গেল, কারণ কি অকারণে জানে না ব্যোমকেশ। শুধু দেখেছে সাদা ধপধপে পা আর শাড়ীর প্রান্ত। আশপাশের গণ্ডোগোল যেন হঠাৎ থেমে গেছে, শুধু লঘু আসা যাওয়া, ফিসফাস কথাবার্তা—যেন একটা অসহ্য আবহাওয়ার ঢেউ চলেছে চারদিকে।

ছেলে কাঁদছে। ভারী বিশ্রী লাগছে। নিস্তব্ধ বাড়ীখানা। ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল। একবার, আরো একবার তাকাল বিছানার বালিসের দিকে। হাত দিয়ে একবার ছুঁলো। তারপর দেখলো, ঘড়ির কাঁটা কাটা দাগের মধ্যে আনাগোনা করছে। এবার তাকালো ছোট জানালাটার মধ্য দিয়ে—দূরে একটা নিমগাছ। কচি সবুজ পাতা কেমন হাওয়ায় কাঁপছে ঝিরঝিরে দোলানিতে। তার ওপর এসে পড়েছে বেলাশেষের রোদ। অদ্ভুত ভাল লাগছে। ডাকছে দুএকটা পাখী—শালিখ কি চড়ুই।

বালিশ ধরা হাতটা একবার নাকের কাছে আনল ব্যোমকেশ। একটা অদ্ভুত শিহরণ খেলে গেল। চক্ চক্ করে উঠল তার চোখ; কিন্তু ততক্ষণে সেই বুড়ো ভদ্রলোক এসে পড়েছেন: আমিতো ভাবতেও পারিনি, সত্যি কথা বলতে কি—আনন্দে কথা আটকে যায় বার বার। বিছানার এক প্রান্তে এসে বসলেন। কোঁচার খুঁট দিয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে হাওয়া খেতে থাকেন, শেষকালে বলেন: আমি বলেছিলাম আপনি আসবেন।

এবার ব্যোমকেশ বলে: আমাকে আপনি বলবেন না—সেটা বড় খারাপ শোনায় আমার কানে—

—সত্যি কথা বলতে কি আমি ত তাই ভাবছিলাম, কিন্তু তোমরা আজ কালকার ছেলেমেয়ে, বলতে সাহস হয় না। তোমাকে আমি নীতার চেয়ে পর ভাবতে পারছি না। ব্যোমকেশ চুপ করে থাকে।

ভদ্রলোক আবার সুরু করেন: নিজের চোখেইত দেখলে বাবা আমাদের অবস্থা, কোন মতে বেঁচে আছি। এখন যদি তুমি মেয়েটাকে স্থান দাও তবে আমাদের যা উপকার হয়।

ব্যোমকেশ বলে: আপনি কিছু ভাববেন না—আমাকে বিশ্বাস করুন। আমি যখন এসে পড়েছি একটা ব্যবস্থা হবেই হবে।

– ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, হাত জোড় করে প্রার্থনা জানান বৃদ্ধ।

ব্যোমকেশ বলে: আপনার ছেলেকে মানে বিশ্বেশ্বর বাবুকে একবার দেখতে চাই।

—না না সে পরে হবেখন—পরে হবে। তুমি বসো, আজ একটু চা খেয়ে যেতে হবে।

প্রবল আপত্তি জানায় ব্যোমকেশ: না—না চায়ের দরকার নেই, আমি এইমাত্র খেয়ে এলাম।

—আমরা গরীব—খুবই গরীব। আমাদের চা তোমার মনোমত হবে না জানি, তবু তোমাকে এই বুড়োর কথাটা রাখতে হবে। চা তোমাকে খেয়ে যেতেই হবে।. আর কিছু দেবার সামর্থ নেই আমাদের—ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন একসময়ে।

জানালা দিয়ে আবছা আলো এসে পড়েছে। সোনালী দিগন্ত। বাইরে বিকেল ঘন হয়ে এসেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে সন্ধ্যে নামবে।

সমস্ত শরীর যেন আনন্দে অবশ হয়ে আসছিল ব্যোমকেশের।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে একটি মেয়ে ঘরে এসে ঢুকল। কালো স্বপ্ন-নিবিড় চোখের তারা, ঘন আঁখি পল্লব। ঠোঁট দিয়ে উঁকি দিচ্ছে একটা দাঁত, সাদা মুক্তোর মত। কাঁধের ওপর লোটানো অল্প রুক্ষ চুল। চায়ের কাপ নিয়ে আরো এগিয়ে এল মেয়েটা—আরো কাছে। আকাশের কোণ থেকে দীর্ঘ আর তির্যক একটা আলোর রেখা এসে পড়েছে মেয়েটার চোখে মুখে। সেই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঠেলে আসা দাঁত, ছোট আর মুক্তোর মত উজ্জ্বল। হঠাৎ মাথার ভেতরটা কেমন করে উঠল ব্যোমকেশের। সহজে চোখ পড়ল—মাথারি চুলের এক পাশে গভীর ক্ষতের ওপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আর সেই মুখ—সেই মেয়েটার মুখ আরো স্পষ্ট হয়ে এল। ডান হাতটা কাঁপতে লাগল থর থর করে। ভীষণভাবে আরো একবার তাকালো মেয়েটার দিকে। নিস্পৃহের মত অকৌতূহলী দৃষ্টি তার দিকে তাকিয়ে। তবে কি চিনতে পারে নি—তাকে চিনতে পারেনি?

মেয়েটি বলল, শুনল ব্যোমকেশ: চা খান, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে! অদ্ভুত সুর, গানের মত সুরেলা।

চায়ের কাপটা টানতে টানতে জিগ্যেস করল ব্যোমকেশ: আপনার দাদু কোথায়? তাকে দেখছি না যে?

—আসছেন। বলে একটু সরে দাঁড়ল মেয়েটা।

আরো একবার তাকাল ব্যোমকেশ। আরো একবার! মেয়েটা তাকিয়ে আছে তার দিকে। চোখে তার বিদ্যুতের প্রস্তুতি মনে হল। বেলা শেষের আলো আরো উজ্জ্বল হয়ে এসে পড়েছে তার মুখে। অদ্ভুত লাগছে। কিন্তু কাটা দাগটা—খচ্ করে উঠল যেন বুকের ভেতরটা শরীরের অনেকটা রক্ত হঠাৎ যেন ছুটে এল বুকের ভেতরের ফুসফুসে। হঠাৎ যেন ফেটে যাবার মতন হলো। ডান হাতটা কাঁপছে। হাতে চায়ের কাপটা। এখুনি হয়ত চা চল্‌কে পড়ে যাবে। কাঁপা

গলায় জিগ্যেস করল ব্যোমকেশ: আপনার কপালের ঘা-টা সারেনি এখনো?

—কপালের ঘা?—হটাৎ যেন ছিটকে এল কথাটা, কে বলেছে—দাদু? না দাদু জানে না। ঘা ও নয়, পুলিশের লাঠির দাগ। ঘা সারেনি এখনো দাগও মেলায়নি কিন্তু—থামলো মেয়েটা।

চোখ তুলে আবার নাবিয়ে নিল চোখটা ব্যোমকেশ।

আর হঠাৎ যেন চোখটা পড়ল ব্যোমকেশের, জানালায় বিকেলের সেই শেষ আলোর রেখাটুকু কখন দূরে সেই নিম গাছটার ওপাশে ঢাকা পড়ে গেছে। ঘরে রাত্রির আমন্ত্রণে আবছা অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে।

তেমনি দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। ঘন অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়া-মূর্তির মত।

এতক্ষণে গলা পাওয়া গেল সেই ভদ্রলোকের: কিরে অন্ধকারে বসিয়ে রেখেছিস, একটা আলো আনতে হয় না?

পায়ের আওয়াজে সচকিত হয়ে তাকাল ব্যোমকেশ। অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পেল ছায়া মূর্তিটি বাইরে বেরিয়ে গেল। একা বসে রইলো ব্যোমকেশ। চোখের সামনে ভেসে উঠল ধর্মতলার উদ্বাস্তু মিছিলের একটা ছবি।

—এতক্ষণে আরো স্পষ্ট হয়ে মনে পড়ল পুলিশের লাঠিতে কেটে গেছল মেয়েটির মাথার এক পাশটা। রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল কাপড়ে। পরমুহূর্তেই ঝট করে একটা আওয়াজ—হাতটা ঝুলে পড়ল এক পাশে। তাকিয়ে দেখল একটা আধলা ইঁট গড়িয়ে পড়ল পায়ের কাছে। হাতটা ফুলে উঠেছে ততক্ষণে। টেবিলের ওপর মোম আর দেশলাই আছে, জানে ব্যোমকেশ। একবার আলোটা জ্বালতে চাইলো। চেঁচিয়ে বলতে চাইল: এখানেই দেশলাই আর মোম

আছে। কিন্তু ডানহাতটা কাঁপছে ভীষণ। থর থর করে। জামার ওপর থেকে স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে। দেড় সপ্তাহ আগে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে কাজে জয়েন করেছে। ভাল হয়ে গেছল হাতটা। কিন্তু এখন যেন অসহ্য ব্যথায় টন্‌টন করছে। আর মনে হচ্ছে সেই শুক্‌নো দাগটা আবার যেন পেকে ফুলে উঠেছে।

প্রাণ যায় যাক

এক জোড়া জুতো আর না কিন্‌লেই নয়। যাকে বলে সামনের মাসে সবচেয়ে প্রথম এক জোড়া জুতো অন্ততঃ কিনতেই হবে। যা বিশ্রীরকম ছিঁড়েছে জুতো জোড়া—আর পরার উপায় নেই। পাঁচটা আঙুলের মধ্যে দুটো আঙুল সদম্ভে মাথা বার করে উঁকি মারছে। জুতো জোড়া হাতে তুলে ভাল করে লক্ষ্য করে সুধীর, সেলাই করে চালানো যায় কিনা! চার পাশের জোড়াগুলো হাঁ করে আছে। কোনাচে হয়ে বেঁকে গেছে হিলের মোটা আর পুরু চামড়া। আর সোলের মাঝখানে চাকা চাকা গর্ত্তে ভরে গেছে। হ্যাঁ, এই জন্যেই ত একটুখানি পথ চললেই পা কাদা-জলে ভরে ওঠে। মনে মনে একটা হিসেব করে সুধীর। শুধু দুটো তাপ্পি দিলেই চলবে না, হিলটা করিয়ে নিতে হবে আর হাফসোলও না দিলে নয়। তা হলে ধরগে তাপ্পি দুটো চার আনা, হাফসোল আর হিল দিতে নেবে একটাকা চার আনা। অন্ততঃ একটাকার কম কিছুতেই নয়—বাজি ফেলতে পারে সুধীর। তা হলে সবশুদ্ধ হল একটাকা চার আনা। না এ কটা দিনের জন্য এত ভাল করে সারিয়ে কি হবে, তার চেয়ে দুটো তালি দিয়ে নিলেই হবে। একটা দিন বই ত নয়! কষ্ট করে চালাতেই হবে। তার

'পরেই ত নতুন চকচকে একজোড়া জুতো কিনবে সুধীর। নতুন জুতোর অস্পষ্ট চিমসে গন্ধটা একবার ভাবতে চেষ্টা করে সুধীর; চলতে ফিরতে মসমস করবে। আঃ ভাবতেও ভাল লাগে। কতদিন এক জোড়া মনের মত জুতো পরেনি। ক্যালেণ্ডারের তারিখ আর বার গুণে বার করে নেয়—মাসের আর কটা দিন হাতে আছে? তারপর মাকে বলে কয়ে টাকাটা আদায় করে নিলেই চলবে। একটা গানের কলি ভাঁজতে থাকে সুধীর সুর করে।

পাশের ঘরে ছোট ভাইবোনগুলো পড়ছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। সেখানে এসে বসে সুধীর। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে: কি পড়ছিস দেখি? হাতের কাছে যাকে পায় তাকেই বলে: দেখি তোর পড়া? সে কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে: পড়া ত হয়নি বড়দা; এই ত সবে এসে বসলাম—

তাতে কি হয়েছে, এইটুকুন পড়া করতে কতক্ষণ লাগে? আমরা ছোট বেলায় বইটা একবার দেখেই পড়া বলতে পারতাম। তারপর এমন ভাবে তাকায় তাদের দিকে, যেন আর আশা নেই: সারা জীবন ধরে ঘষলেও কিচ্ছু হবে না তোদের। হাতের কব্জির দিকে এমন ভাবে তাকায় যেন ঘড়ি দেখছে। বলে—পাঁচমিনিট সময় দিলাম, সকলের পড়া তৈরী চাই। যদি না পারিস ত—এই বলেই একটা গাঁট্টা কসায় হাতের কাছে যাকে পায়। অমনি সমস্বরে সকলে পড়া সুরু করে দেয়। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে হঠাৎ সুধীর বলে: চুপ্, হয়ে গেছে পাঁচমিনিট।

একজন বলে: সে কি বড়দা, এর মধ্যেই পাঁচ মিনিট? এই দেখ পাঁচ লাইন ত সবে পড়েছি।

ধমকে ওঠে সুধীর: তা হোক, পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে ঘড়িতে। একটু থেমে কোমরে হাত দিয়ে কি যেন খোঁজে, তারপর বলে:

হ্যাঁ, যা ত একটা সিগারেট কিনে নিয়ে আয়, পরে পয়সা নিয়ে নিস এক সঙ্গে। কে যাবি প্রবীর? অধীর তোর কপয়সা হল?

—সাড়ে সাত আনা।

—প্রবীর, তোর?

—সোয়া বারো আনা।

—বলিস কি রে? বিশ্বাস করি বলে বাড়িয়ে বলছিস ত?

প্রবীর ভীষণ ভাবে মাথা নেড়ে বলে: সে কি! তুমি ত বললে বড়দা কালকে হিসেব করে—ন' আনা ছিল, আর কালকেই ত নিলে তের পয়সা।

—তাই নাকি, আমার একেবারেই মনে নেই, কত কথা মনে রাখি বল ত? কম ত কাজ নয় আমার, তবে আজ বেলা যা, তোর বোধ হয় সবচেয়ে কম হয়েছে?

অগত্যা বেলাকেই যেতে হয় সিগারেটের সন্ধানে।

সিগারেট পেয়ে সুধীর বলে: তোর হবে, লেখা পড়া তোর হবে—বুঝিলি বেলা।

গলির রোয়াকে বসে সিগারেট টানে আর পাড়ার লোক ডেকে গাল-গল্প করে: কি দাদা খবর কি—বাজার থেকে বুঝি? ওখানা হাতে কি? খবরের কাগজ বুঝি, দেখি কাগজটা—বলে উঠে এসে বিনা দ্বিধায় হাত থেকে টেনে নেয়। তারপর হেসে বলে: কি যে এক বদ অভ্যেস করেছি দাদা, সকাল বেলা কাগজটা না দেখলে দিনটা যেন কাটতেই চায় না। আরে দাদা দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না—বলে হাত দিয়ে রকের ধূলোগুলো ঝেড়ে দিল সুধীর।

ভদ্রলোক অবশ্য বসলেন না, বললেন: থাক্ থাক্ কিছু অসুবিধে হচ্ছে না। প্রত্যেকটা লাইন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে থাকে সুধীর।

বেলা বেড়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে। রোদের তাতও বাড়ে। ভদ্রলোক

অধৈর্য্য হয়ে ওঠেন, উসখুস্ করতে থাকেন। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না সুধীর: কি খেলেছে মোহনবাগান দেখেছেন, ফোর টু ওয়ান। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হাসে আর বলে: ফোর টু ওয়ান, খুব দিয়েছে যাকে বলে। এবার মুখ তুলে বলে: আপনার তাড়াতাড়ি আছে বলে মনে হচ্ছে—

ভদ্রলোক যেন এতক্ষণে কথা খুঁজে পেলেন: হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি আছে, মানে—বুঝলেন, অপিস আছে কি না।

—ও, তা মিছি মিছি দাঁড়িয়ে আছেন কেন, যান না। ও—কাগজটা বুঝি? সে আমি একটু বাদে বাড়ী গিয়ে দিয়ে আসব, কিছু ভাববেন না। ১৩।২ ত? ও আমি চিনি।

ভদ্রলোক বললেন: না না, ২।এ ওই মোড়ের বাড়ীটা হোলদেরঙ-এর—

—ও আর বলতে হবে না, কিছু ভাববেন না, ও দিকে আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে আবার।

ভদ্রলোক চলে যান।

সুধীর খিস্তি করে: শালা ভারী ত চার পয়সা দামের কাগজ! সুধীর সেন কারো চার পয়সা দামের কাগজ নেয় না, হ্যাঁ। কাগজখানা হাতে করে বাড়ী ঢোকে সুধীর। তারপর ডাকে: মাগো, চা কই আমার? চা দাও।

মা'র গলা পাওয়া যায়: ওই যে আমাদের বড়বাবু এলেন। আসুন আসুন অপনার জন্য চা, টোষ্ট তৈরী আছে, আসুন।

এ-সব শুনতে কষ্ট হয় না সুধীরের। হাসিমুখে রান্নাঘরে গিয়ে বলে: দেখি কি আছে, বা রে—চা দাও।

—এতক্ষণ কি রাজকার্য হচ্ছিল শুনি? সেই সকালে চা হল, জুড়িয়ে বরফ হয়ে গেছে কোন কালে।

—একটু গরম করে দাওনা মা।

—না এখন গরম হবে না। অধীরের ভাত হচ্ছে, ভাত নামলে তবে চা গরম হবে।

—ভাতটা একটু নামিয়ে করে দাওনা চাটা গরম, কতক্ষণ আর লাগবে?

—হবেনা বলছি, ওর অপিসের সময় হয়ে গেছে, আর ছোটগুলোও স্কুলে যাবে। তোর ত বাপু কাজকর্ম নেই, অত তাড়া কিসের শুনি?

—আচ্ছা মা, তোমার রোজই এক কথা কেন শুনি—কাজকর্ম না থাকলে কি আগে চা খেতে নেই? অধীর যদি এখন চা চাইত তুমি না দিয়ে পারতে?, বলতে পারতে এ রকম ভাবে—

মা বিশ্রীভাবে মুখ ভেংচে হাত-পা নেড়ে বলেন ওরে আমার লাট সাহেব রে, বলি তোর লজ্জাও করে না, ছোট ভাই রোজগার করে খাওয়াচ্ছে। লজ্জা করে না তোর, তোর সংগে ওর তুলনা? ছি! ছি! গলায় দড়িও জোটে না—

আশ্চর্য্য রকমের কুৎসিত আর ঘৃণ্য বলে মনে হল মাকে। তবুও সুধীর বলল: না লজ্জা করে না, বড় ভাই ছোট ভাইয়ের খাবে তাতে আবার লজ্জা কি? আমি রোজগার করলে ওকে খাওয়াতাম না? তারপর আবার হেসে বলে: ভাল দড়ি খুঁজে পেলে ত, ততক্ষণ চা খেতে ত আর বারণ নেই। দাও মা শিগ্‌গির গরম করে।—আশ্চর্য্য রকমের নির্লজ্জ বলে মনে হল তাকে।

ছোট ভায়েরা হুড়দাড় করে এসে খেতে বসে যায়। অধীরও এসে খেতে বসে। সুধীর কিন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখে রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে সারি সারি তিন জোড়া জুতো। কেমন মসৃণ আর চক্‌চকে। সূর্যের আলো যেন ঠিকরে যাচ্ছে। কোনখানে একটুকু ফাটেনি, দাগ লাগেনি। পুরো আর আস্ত ছিল, কেমন অদ্ভুত সুন্দর।

তিন ভায়ে মিলে ভাত খাচ্ছে। গরম ভাতের কেমন সুগন্ধি ধোঁয়া। মাথা নীচু করে কেমন সবাই হাপুস হুপুস করে খেয়ে চলছে।

মা বলেন: ও কি রে পাতে ভাত ফেলছিস যে, খেয়ে নে, খেয়ে নে—আর একটু ঝোল দি, একটুকরো মাছ? অধীর, আর এক হাতা ভাত দি তোকে, হাঁড়ির তলা থেকে দি—

অধীর ঢেঁকুর তুলে বলে: না মা, আর পারব না খেতে। পেটে আর জায়গা নেই।

মা বলেন: ওই তোর এক কথা—জায়গা নেই—দেখি তোর পেট—আমার মাথা খাস ওই ভাত কটা খেয়ে নে। মার স্বরে স্নেহ যেন ঝরে পড়তে থাকে।

ছোট ভাই সুধীর ভাত খেয়ে বই-এর ব্যাগ নিয়ে বাইরে আসে। ব্যাগের ভেতরে দেওয়া হয় ছোট্ট এলুমিনিয়ামের কৌটো। তার ভেতরে যায় লুচি মিষ্টি, কোন দিন আবার সুজি। সদর দরজার কাছ থেকে সুধীর হাঁক দেয়: সেজদা, দেরী হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি এসো।

জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে প্রবীর মাকে চুপি চুপি বলে: মা আমাকে দুটো টাকা দাও না?

—টাকা, টাকা কোথায় পাব? টাকা নেই আমার কাছে—

—দাওনা মা, বড্ড দরকার। আমি ত কোনদিন চাই না, তুমি ত সবাইকে দাও—

মা বলেন: বাড়ী থেকে ত খাবার দিচ্ছি রোজ, টাকার কি দরকার বল ত? সিনেমা দেখবি বুঝি? সেদিন ত দেখলি, আজ আবার কি—

—সে ত কতদিন হল, ক্লাশের ছেলেরা রোজ রোজ আমার জন্য খরচ করে, আমি যদি একদিন না করি, ওরা কি ভাববে বল? দুটো টাকা দাও, ওরা বড্ড ধরেছে। ওদের আজ মোগলাই পরোটা খাওয়াতে হবে।

—এখন ত হাতে নেই, পরে নিস এখন—

মুখ ভার করে প্রবীর বলে: আচ্ছা না দিলে, বাড়ীতেই আজ ফিরব না দেখো—

নীচে থেকে সুধীর চেঁচিয়ে বলে: সেজদা, দেরী হয়ে গেল।

প্রবীর দুম্ দুম্ করে পা ফেলে চলে যায়।

ভারী বিশ্রী লাগে সুধীরের। কেমন অসভ্যের মত চলছে প্রবীর, নতুন জুতো জোড়া কেমন যা-তা করে নষ্ট করছে। ঘস্‌টে ঘস্‌টে চলেছে, ক্ষইয়ে ফেলবে হিল আর সোল। চলতে চলতে যেখানে সেখানে লাথি মেরে জুতোর জায়গায় জায়গায় চটা উঠিয়ে ফেলবে; বিশ্রী যেয়ো দাগ আর ভাঁজ পড়বে স্পষ্ট হয়ে—ইচ্ছে করে কান ধরে ঠাস করে একটা চড় মারে। যারা নতুন জুতোর মর্ম বোঝে না, তারা জুতো পায়ে দেয় কেন শুনি?

প্রবীররা ততক্ষণে রাস্তায় নেমে পড়েছে।

মা ছুটতে ছুটতে এসে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন: সুধীর, প্রবীরটা চলে গেছে নাকি রে? ডেকে দেনা একবার—

সুধীর রাগে জ্বলছিল, বলল: কেন, কি হবে বল ত?

—ডেকে দেনা বাবা, টাকা দুটো দিয়ে দি। যে ছেলে! হয়ত ফিরবে না আর—

সুধীর চীৎকার করে বলল: না ফিরবে না—বিকেল বেলা ক্ষিধে লাগলে আপনি ফিরবে। ফিরবে না আবার? তোমার পয়সা খুব সস্তা হয়েছে, না? দেখছ জুতো জোড়া কি করেছে, তিন মাসও হয় নি, এরি মধ্যে হিল, সোল ক্ষইয়ে একেবারে শেষ করে ফেলেছে জুতো জোড়া; ওর চলার ধরণ দেখলে সারা শরীর জ্বলে যায়।

মা ধমক দিয়ে বলেন: তুই থাম বাপু, ছেলেমানুষ এই বয়সেই ত দু'চার জোড়া জুতো পরবে। আর এই ত পরার বয়েস। তারপর

বড় হলে ত আর কারো কাছে চাইতে যাবে না। তা তুই দেখনা একবার এগিয়ে গিয়ে, যদি ধরতে পারিস—যা না লক্ষ্মীটী—

এবার সত্যি সত্যি চটে যায় সুধীর: আমি চা খাব না দশটা বাজতে চলল, আমি যে কিছু খেলাম না সে কেউ দেখবে না একবারও—চা না খেয়ে আমি যেতে পারব না, যাও

—তা পারবি কেন? একটা কাজ করতে বললে পারব না, পিণ্ডি গেলার বেলায় ত খুব পারিস—বলি খাওয়া আসে কোত্থেকে শুনি? ছোট ভাইটা মুখের রক্ত তুলে খেটে মরছে, আর বাবু আমার বসে বসে খাবেন লজ্জাও করে না- যা প্রবীরকে আগে ডেকে নিয়ে আয় তবে আজ চা পাবি। কেউ না ফিরলে তোরই ত মজা। পিণ্ডি জুটবে বেশী বেশী করে।

শেষ পর্যন্ত প্রবীরকে ডেকে আনতে হল সুধীরকে। মা অনেক মিনতি করে বুঝিয়ে টাকা দুটো দিলেন প্রবীরকে। অভিমানে প্রবীর গজরাতে লাগল: না, আমার দরকার নেই টাকার, আমি নেব না। আর ফিরব না আজ—

কাঁদ কাঁদ হয়ে মা বলেন: লক্ষ্মী বাবা আমার, মাথা খাস, বাড়ী ফিরিস ঠিক সময়ে—

টাকা নিয়ে হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছিল প্রবীর।

মা ফের বললেন: কখন ফিরবি বাবা—তাড়াতাড়ি ফিরবি ত?

—উত্তর এল: ফিরতে একটু রাত হবে আমার। তুমি মেজদাকে একবার বলে রেখ না?

এক সময় চা পেল সুধীর। ভাঙা কাপটার চুকচুক করে গরম চা খেতে লাগল। কেমন কালচে আর ঘোলাটে হয়ে উঠেছে চা দুপুরের কড়া রোদে। তাই খেতে লাগল সে চুমুকে চুমুকে আরাম করে।

বেরুবার উদ্যোগ করছিল সুধীর, জুতো জোড়ায় ভাল করে পালিশ

দিয়ে নিয়েছে। জুতোর ময়লা দেখলে ভারী গা জ্বালা করে তার। সবে গেছে তুপা অমনি ডান পায়ের জুতোর ফাঁক দিয়ে পায়ের প্রায় সমস্তটাই বেরিয়ে পড়ল। নাঃ! যাওয়ার উপায় নেই। কি করা যায়?

—চার আনা পয়সা দেবে মা?

—কি হবে শুনি? পয়সা নেই এখন—

—জুতো জোড়া ছিঁড়ে গেছে, না সারালে বেরুবার উপায় নেই। পাশ দিয়ে সমস্তটাই ছিঁড়ে গেছে, এই দেখ পা বেরিয়ে যায়।

—পরে নিস্, এখন ত হাতে পয়সা নেই—

—আমার যে এখন একটু বেরুতে হবে; জুতো না পেলে বেরুব কি করে?

—থাক, আজ আর বেরিয়ে কাজ নেই। কি তোমায় এমন রাজকাজ বাপু যে আজ না গেলেই নয়?

মিনতি করে বলে সুধীর: দাওনা মা, চার আনা পয়সা ত, মাত্র—

—চার আনা পয়সা কোন দিন এনে দিয়েছিস্ আমার হাতে? বুড়ো হয়ে গেলি, একটা পয়সাও রোজগার করতে পারলি না? বসে বসে খাচ্ছিস—যা যা, এখন জ্বালাতন করিসনে—

অবাক হয়ে মার মুখের দিকে তাকায় সুধীর, কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে: তুমি প্রবীরকে দুটো টাকা দিতে পারলে আর আমাকে চার আনা পয়সা দেবার বেলায় তোমার গায়ে লাগে!

—তোকে দিয়ে লাভ কি বাজে খরচ একটা। জুতো দুদিন পরে সারালে এমন কিছু অশুদ্ধ হবে না।—আর তাড়াতাড়িটা কি এমন শুনি?

—বারে! আমি বুঝি বাইরে বেরুব না?

মার কাছ থেকে আর কোন উত্তর পাওয়া যায় না।

সুধীর আবার বলে: দেবে না ত, না দেবে ত ভাত খাব না।

—খাব না! মা কেমন বিশ্রীভাবে মুখ ভেংচে হাসলেন: না খাবি ত আমার বয়ে গেল। পেটে ক্ষিদে লাগলে অমনি কুকুরের মত—

এর পরে আর সুধীরের কথা বলার স্পৃহা রইল না। জুতো জোড়া ভাল করে পালিশ করে রেখেছিল সুধীর। আবার ভাল করে কালি দিয়ে ব্রাস করল। তারপর না খেয়েই বেরিয়ে পড়ল সুধীর।

মোড়ের দোকান থেকে ধার নিল দুপয়সার বিড়ি। লোকটা আপত্তি তুলেছিল: কতদিন আর ধারে চলবে সুধীর বাবু? অনেক ত হল…তা ধরুন গে তিন টাকা তের পয়সা, এখন হল তিন টাকা পনের পয়সা। কিছু না দিলে—হয়ত একটা বিশ্রী গালাগাল এনেছিল মুখে, সামলে নিল দোকানদার।

—আচ্ছা কিছুটা দিয়ে দেব এখন। দেখছ ত ভাই যা' অবস্থা হচ্ছে দিনকে দিন।—দোকানের দড়িতে বিড়ি ধরিয়ে সে ভাবে—মনে পড়ে সকালবেলাকার কাগজের কথা,—ভদ্রলোকটিকে ত দেওয়া হল না। কাগজটা নিয়েই বেরুল সুধীর।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হল না সেখানে। অপ্রত্যাশিতভাবে পথে ছেলেবেলাকার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল: আরে সুধীর যে শোন শোন, কি খবর?

সুধীর দেখেছিল আগেই, কিন্তু লুকিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করছিল। মুখে ম্লান হাসি টেনে বাধ্য হয়ে তাকে উচ্ছ্বাসিত হওয়ার ভান করে বলতে হল: আরে কি ব্যাপার? এখন কোথায় আছিস?

হঠাৎ বন্ধুটী মুচকে মুচকে হাসে: দিল্লী থেকে এলাম, কেন জানিস?

নিস্পৃহের মত সুধীর একটা কিছু ভাববার চেষ্টা করে বলে: কি করে বলব, তবে একটা শুভযোগ আছে বলে মনে হচ্ছে—

—তোর সঙ্গে জরুরী অনেক কথা আছে, তার আগে একটা রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে বসি চল; সেই সকালে বেরিয়েছি, খাওয়া হয় নি কিছু। ছু'টো করে মামলেটের অর্ডার দিয়ে গল্প করে বন্ধুটি : দিল্লীর দেওয়ানীখাস দেখতে গেছলাম, সেখানেই মানে আলাপ হল আর কি—তারপর থেকে ভালবাসার সূত্রপাত। আমি বাবাকে জানিয়েছি ওকে ছাড়া—

সুধীর বলে : শেষকালে দিল্লীওয়ালী কেড়ে নিল মন?

—যা বলেছিস ভাই, ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না, অন্য কাউকে বিয়ে করা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না আমি।

বয় মামলেট দিয়ে যায় প্লেটে করে। কেমন পেঁয়াজ আর সস্তা ঘিয়ের সোঁদা গন্ধ। জিভে জল আসে সুধীরের। বন্ধুর সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, গল্পে মেতে গেছে একেবারে। মনে মনে গালাগাল দিল সুধীর : প্রেমে যেন আর কেউ পড়ে না কোনদিন, শালা হ্যাংলা কোথাকার। মামলেটটা আগে খেয়েনি ত বাবা, তার পরে যত গল্প করার ক'রো। ভাল ছেলের মত মনোযোগ দিয়ে শুনব।—প্লেটটা সামনের দিকে টানবে কি না ভাবছিল সুধীর···

কিন্তু হঠাৎ সুধীরের পায়ের দিকে বন্ধুটির চোখ পড়ে যাওয়াতে জিগ্যেস করল অবাক হয়ে : হ্যাঁরে, কি হয়েছে তোর, খালি পায়ে যে?

হঠাৎ কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না সুধীর—চার আনা পয়সার জন্য জুতো সারাতে পারে নি, লজ্জায় এ-কথা আনতেও পারে না মনে। আমতা আমতা করে বলে : বাবার—

তাকে থামিয়ে দিয়ে বন্ধুটি লাফিয়ে উঠে বলে : বাবার—তুই জামা পরেছিস্?

কেমন ঘাবড়ে যায় সুধীর, গলা শুকিয়ে যায় তার, ঢোক গিলে বলে : বাবা নয়, বাবার এক ভাই দূর সম্পর্কের আর কি—

—ও তাই বল, ঘাবড়ে দিয়েছিলি আর কি। দূর সম্পর্কের অশৌচ তোরা মানিস?

সুধীর সামলে নিয়েছে ততক্ষণে; হেসে বলে: না মেনে উপায় কি বল? আমার মা আবার বুঝিস ত ভারী গোঁড়া, সেকালের মানুষ কি না—

মাথা চুলকে বন্ধু বলে: তবে ত তোর মাম্‌লেট চলবে না বোধ হয়? সত্যি আমার মতে খাওয়া উচিত নয়, অশৌচ মানছিস যখন। তাহলে ওঠা যাক, তুই খাবি না আমি একা একা, কি করে হয়, সে ভারী অভদ্রতা। আশ্চর্য্য কায়দায় মুখে হাসি টেনে এনে কথাটা উড়িয়ে দিতে চায় সুধীর: থাক থাক আমার সঙ্গে তোর আর ভদ্রতা করতে হবে না। পকেটে থাকে ত একটা সিগারেট দে।

রাস্তায় লোকজন কমে এসেছে। রোদ নেমেছে আরো প্রখর হয়ে। আকাশটা কেমন উজ্বল নীল।

একপাশে বন্ধুটি মামলেট খেতে খেতে গল্প করছে তার বান্ধবীর। জীবনের রসাল কাহিনী।

পেটের ভেতরটা কেমন করছে সুধীরের। কেমন পেঁয়াজ আর সস্তা ঘিয়ের সোঁদা গন্ধ। জিভে জল এসে যায় সুধীরের।—অনেক উঁচুতে উড়ে যাচ্ছে দুটো চিল। সামনেকার ট্রামের তারের ওপর কটা কাক দোল খাচ্ছে। দু'একটা ঘেয়ো কুকুর ঘুরছে আশে-পাশে। হয়ত কোন নতুন বই দেখছে প্রবীর। আর ঘাড় বাঁকিয়ে লেজারের হিসেব মেলাতে ব্যস্ত অধীর। মনে মনে একটা চিন্তা করে সুধীর, এর মধ্যে যদি হঠাৎ বিয়ে হয়ে যায় বন্ধুটির বিয়ের নেমন্তন্নটা ফসকালে চলবে না; এর মাশুল সেদিন তুলতেই হবে। অশৌচ আর কদিন আছে! হঠাৎ কিছু না বলে একটু ভাবতে হবে, ভেবে বলতে হবে ওকে। অত দামী সিগরেটটাও কেমন তেতো লাগে সুধীরের।



এতক্ষণ বাদে রান্নাঘরের কাজ সেরে ফিরলেন ইন্দুপ্রভা। আজ একটু দেরীই হয়ে গেল বুঝি! বাইরে রাত্রি নিঝুম। ছমড়ি খেয়ে পড়েছে যেন সারাটা আকাশ জুড়ে। জানলার কাছে সরে এলেন তিনি। পর্দাটা সরিয়ে দিলেন হাত দিয়ে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া হঠাৎ পথ চেয়ে যেন ছিটকে এল ঘরের ভেতরে।

নভেম্বরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কেমন শির শির করে উঠল সারা শরীর। একটা প্রসন্ন স্নিগ্ধতায় ভরে উঠল সারাটা হৃদয়। একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি। সারাদিনের মধ্যে একটু অবসর খুজে পেয়েছেন— একটু অবসর—এক টুকরো নিস্তরঙ্গ জীবন!

শীতের প্রারম্ভের শিরশিরানি আর হিমে রাস্তাটা কি নিঝুম! দূরে গ্যাসবাতিটা একচোখে তাকিয়ে ঝিমুচ্ছে। অকারণে ঠিক এমন সময় স্বামীর কথা মনে পড়ে গেল। আশ্চর্য! আজ এতদিন পরে ঠিক আগের মত সূক্ষ্ম ব্যথার কাঁটা খচ্ খচ্ করে উঠল না বুকের ভেতরটায়। মনে হল মানুষ কত মিথ্যে কথা বলতে পারে। লোক দেখানো মান রাখার জন্য এমন কত রাত ব্রজবল্লভের বুকে মাথা দিয়ে

কাটিয়েছেন তিনি। আজেবাজে কত কথায় সময় ফুরিয়েছে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে ঘুরে রাত্রির সীমানা পার হয়ে গেছে কখন, খেয়াল করেন নি তারা। তারপর সারাটাদিন ঝিমুতে ঝিমুতে গেছে। লোকজন কত ঠাট্টা করেছে সেজন্য। অনেকে ত মুখের ওপর জিগ্যেস করে বসেছে: আচ্ছা সারাটা রাত তোমরা কর কি গো? ঘুমের চোখে ভাত খেতে বসে ব্রজ জল ঢেলে দিলে পাতে। ঘুমোও না নাকি সারা রাত?

লজ্জায় উত্তর দিতে পারেন নি ইন্দুপ্রভা। মুখ তুলতে পারেন নি লোকের সামনে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন, না—আর নয়, এমন আর হতে দেবেন না। কিন্তু রাত্রে স্বামীর কাছে গিয়ে—ব্রজবল্লভের পাশে শুয়ে মুখ ভার করে থাকতে পারেন নি কোনদিন। কখন কেমন করে যে কথা আদায় করে নিয়েছে, খেয়াল পর্যন্ত করেন নি। রাগ করে কখনো বলেছেন স্বামীকে: আচ্ছা আজকে কি কেলেঙ্কারী করেছ বলত, লজ্জা করে না তোমার?

হাসতে হাসতে উত্তর দিতেন ব্রজবল্লভ: লজ্জা কিসের, আর কেলেঙ্কারীই বা কিসের? ঘুমের ঘোরে ভাতে জল ঢেলেছি এই অপরাধ?

—না অপরাধ হতে যাবে কেন? খুব ভাল কাজ তুমি করেছ।

—না ঘুমোলে এ সবাই করে থাকে—

—রাত ভরে ঘুমোও না সেটা লোকের সামনে জাহির না ক'রলে বুঝি চলে না?

—বিয়ে করলে যে কেউ ঘুমোয় না, একথা সবাই জানে। না বললেও বোঝে।

এরপরে আর না হেসে থাকতে পারেন নি ইন্দুপ্রভা: কিন্তু বিয়েত সকলেই করে, তোমার মত এমনটি আর দেখিনি কোথাও—

আকাশ থেকে মাটিতে পড়তেন ব্রজবল্লভ। অবাক হয়ে বলতেন: আমি ছাড়া আরো অনেকের সঙ্গে রাত্রি জেগেছ নাকি? সর্বনাশ! একথা ত জানতাম না।

এ রকম পরিহাসের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না ইন্দুপ্রভা। চটে উঠে বলতেন: দূর অসভ্য কোথাকার—তারপরে কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য—তারপরে আবার কখন যে ব্রজবল্লভ তাকে গল্পের মধ্যে টেনে নিতেন, টেরই পেতেন না ইন্দুপ্রভা। ব্রজবল্লভ খোসামোদের সুরে বলতেন: সকলে বিয়ে করে সত্যি, কিন্তু তোমার মত বৌ কটা লোকে পায় বলত? যেমন রূপ, তেমন গুণ আর তেমন—তারপর আর কারও কোন কথা বলার মত উপায় থাকত না। অন্ততঃ সে সময়টা নিজের গুণাবলী শোনার মত মনের অবস্থা বা ধৈর্য কোনটাই থাকত না ইন্দুপ্রভার।

তখন মনে হয়েছে এর চেয়ে স্বর্গে গিয়েও বুঝি সুখ পাবেন না ইন্দুপ্রভা। ব্রজবল্লভকে ছেড়ে বেঁচে থাকাও দুঃসহ মনে হয়েছে। তারপর পেটে খোকা এল। এল শান্তি। সেই উদ্দাম যৌবনের উচ্ছলতা ক্রমেই কমে এল। তারপর একেবারে স্বাভাবিক।

বিছানায় মেয়েটা ঘুমের চোখে বিড়বিড় করে বকে উঠল। এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেলেন ইন্দুপ্রভা। মনে পড়ল সেদিনের কথা—সে জীবনের স্রোত কোথায় মজে গেছে। আজ আর তার চিহ্নমাত্র নেই। বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল ইন্দুপ্রভার। আজকে এখানে দাঁড়িয়ে সেই মরা অতীতের কোন কিছু ছোঁয়া যাবে না, কাউকে কাছে পাওয়া যাবে না। একবার নিশ্বাস ফেলে পর্দাটা টেনে দিলেন ইন্দুপ্রভা। মুড়ে রাখলেন মরা অতীতের ঝাপসা ইতিহাসের পাতা।

মেয়েটা তখনো কি যেন বকছে শুয়ে শুয়ে। এবার কাছে সরে

এলেন ইন্দুপ্রভা। মশারীর কোনাটা তুলে ঝুঁকে পড়লেন বিছানায়। ধাক্কা দিলেন মেয়েকে আস্তে আস্তে : শান্তি—অ শান্তি—ভাল করে সরে শোত মা। নিজেই টেনে সরিয়ে দিলেন ছড়ানো হাত-পা। মেয়ের দিকে চেয়ে কেন জানি হঠাৎ কান্না এল ইন্দুপ্রভার। গালের কাছের হাড়টা কেমন অদ্ভুত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট হয়েছে গলার কণ্ঠা। সেদিনের—চোখ বুজলেই ভেসে ওঠে একদলা মাখনের মত নরম তুলতুলে মেয়েটা। মাথায় কালো কোঁকড়ানো চুল আর আশ্চর্য নীল পটভূমিকায় কালো চোখের তারা।

কিন্তু সে কালো চুল অনেকটা উঠে গেছে। তেলের দুর্মূল্যতায় সব সময় তেল জোটাতে পারেন নি তিনি। কপালের কাছটায় অনেকটা টাকের মত হয়ে উঠেছে। মেয়ে কেঁদেছে। অভিমান করেছে কতদিন। কিন্তু এক শিশি সুগন্ধি তেলের বিলাসিতা করার সুবিধা হয়ে ওঠে নি। আর সেই কালো চোখ কপালের নীচের অনেক গভীরে আত্মগোপন করেছে আজ। আর সেই নীল পটভূমিকার কালো তারা—অনাহার আর রক্তহীনতায় সাদা ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে, ধোঁয়া আর অন্ধকারে ক্ষয় হয়েছে। কালো তারায় কেমন খ্যাপাটে কুকুরের দৃষ্টি।

কালকেই কি ভীষণ বড় আর চোয়াড়ে মনে হয়েছিল মেয়েটাকে। শুধু ডাল আর ভাত খেয়ে কি করে এত বাড়ন্ত গড়ন হয় অনেকক্ষণ ভেবেও কিনারা করতে পারেন নি ইন্দুপ্রভা।

আশেপাশের কোন বাড়ীর ডলি না কি নাম মেয়েটার—তার সঙ্গে খুব ভাব শান্তির। অনেকবার দেখেছেন। এসেছে মেয়েটা দুপুরের দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে। ওদের আর গল্পের শেষ নেই যেন। তার কাছেই বুঝি দেখেছে কাপড় কি যেন নাম—এখন এই গভীর রাত্রে নামটা কিছুতেই মনে পড়ল না।

খোকাকে ভাত দিচ্ছিলেন তখন। ঘাড় নীচু করে ভাত খেয়ে যাচ্ছিল খোকা। সামনে বসে ভাত দিতে দিতে লক্ষ্য করছিলেন ইন্দুপ্রভা। অনেকবার ধরে শুধু শুধু মেয়েটা যাওয়া আসা করছিল। আর এক একবার কাছে এসে কিছু বলতেও চেষ্টা করেছিল মেয়েটা। তারপর অনেকক্ষণ পরে অনেক কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল শান্তি।

—কি চাই? জিগ্যেস করলেন ইন্দুপ্রভা।

—হ্যাঁ একটু থেমে, তারপর অনেকক্ষণ জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। তারপর একবার তাকালো দাদার দিকে আর একবার মায়ের দিকে।

কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন ইন্দুপ্রভা। একটু যেন ঘাবড়ে গেল শান্তি, তার পর বললে: মা, আমাকে শাড়ী কিনে দেবে? কি যেন নাম শাড়ীটার—আজ আর মনে পড়ছে না। না নামটা বলে নি শান্তি। বলার আগেই ধমক দিয়ে উঠেছিলেন ইন্দুপ্রভা।

—কেন শাড়ী না হলে বুঝি ধিঙ্গিপনার আর সুবিধে হচ্ছে না?

—ধিঙ্গিপনা? অবাক হয়ে চেয়েছিল শান্তি। কেমন অদ্ভুত বেয়াড়া দেখাচ্ছিল—কেমন ন্যাকা ন্যাকা। যেন বুঝতেই পারে নি কথাটা।

রাগে সর্বশরীর জ্বলে উঠেছিল ইন্দুপ্রভ র: না কাপড় পাবে না, যাও। তারপর মেয়েটা বোকা মুখ নিয়ে চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ নিজের মনে বকবক করেছিলেন: সেদিনকার মেয়ে, যেন কাপড় না পরলেই নয়; এমনি দিন দিন যেমন ফেঁপে ফুলে উঠছে দুচারদিন পরে কাপড় না দিলেই চলবে না। তবে এখন থেকে মায়ের বুকের ওপর চেপে না বসলেই বুঝি নয়? তারপর মেয়ের বিয়ের জন্য দিন দিন কেমন চিন্তিত হয়ে পড়ছেন তা বোঝাতে গেছলেন খোকাকে, কিন্তু তার অনেক আগেই খোকা খেয়ে চলে গেছে। তখন সেই মুহূর্তে ব্রজবল্লভের কথা মনে হয়েছিল ইন্দুপ্রভার আর কেন জানি আকণ্ঠ ঘৃণার ভারে গলার ভেতরটা বুঁজে এসেছিল। পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি

বুক নিয়েও ব্রজবল্লভকে কাপুরুষ মনে হচ্ছিল। সমস্ত দুরূহ কাজের ভার ইন্দুপ্রভার হাতে ছেড়ে দিয়ে সময় মত সরে পড়েছে।

কিন্তু আজকে এই মুহূর্তে কেমন শিশু শিশু মনে হচ্ছিল শান্তিকে। কেমন নির্জীব মরার মত পড়ে আছে বিছানার এক কোনায়। কেমন মায়া হতে লাগল ইন্দুপ্রভার। মনে হল সেদিন শুধু শুধু অত কঠিন হবার দরকার ছিল না। দরকার ছিল না অত কঠোর হবার। সত্যি ত মেয়েটার স্বাদ আহ্লাদ বলে কিছু নেই? কোনদিন হাত পেতে কারো কাছে কিছু চায় নি। তিনি নিজেই মাঝে মাঝে অনুভব করেছেন মনের দারিদ্র। মেয়েকে দিতে পারেন নি একদিনও একটা সুন্দর জামা, দিতে পারেন নি মাথার গন্ধ তেল। নিজেই বিদ্যাগ্রহণের পথ বন্ধ করেছেন মেয়ের। তিনি জিদ করে যেতে দেননি স্কুলে। এমন কি খোকা সেও বাধা দিয়েছিল: না মা এখনও তেমন বয়েস হয় নি। স্কুলে যাক না আরও কটা বছর!

চোখ কপালে তুলে ইন্দুপ্রভা বলেছিলেন: বয়েস হয়নি বলিস কি রে খোকা? এবার বারো গিয়ে তেরোয় পড়ল। বয়েস হয় নি? তার ওপর যা বাড়ন্ত গড়ন, তার ওপর—বলে দম নিয়েছিলেন ইন্দুপ্রভা: শুধু ডাল ভাত খেয়ে অত ফুলে ফেঁপে ওঠে কি করে তাই ভাবি—দুঃসময়ে সবই উলটো হয় বুঝলি?

কিন্তু খোকা কোন উত্তর দেয় নি।

—তা ছাড়া শুধু কতগুলো বাজে খরচ। স্কুলের মাইনে আছে, আছে বই খাতা, টুকিটাকি আরও কত খরচা। কোন কাজে লাগবে ভেবেছিস? ও পয়সাটা জমালে বরং ওটুকুই সম্বল।

মাথা নেড়ে সায় দিতে হয়েছে খোকার। বলতে হয়েছে: হ্যাঁ, বুঝেছি—

কিন্তু এত গেল বাইরের কথা। এর ভেতরে আরও অনেক কিছু

তীব্র তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। তাকে আরও বেশী ভাবিয়ে তুলেছিল শান্তির ভবিষ্যৎ। সেই যে কথায় কথায় চোখের টান, চালাক-চতুর ভাব, সংস্কারহীন নতুন জীবন—যা কোনদিন ইন্দুপ্রভার জীবনে আসে নি। তাকে তিনি ভয় করেছিলেন। সত্যি যদি শান্তি কিছু করে বসে?

বলা যায় না আশেপাশের বাড়ীর ছোঁড়ারা যেন ওঁৎ পেতে আছে। মনে মনে ভাবলেন ইন্দুপ্রভা, নিজেই ত কয়েকজনকে দেখেছেন—কাউকে দেখেছেন চন্‌মনে চোখে চাইতে যদি শান্তি তাকায়। অবশ্য শান্তির দিক থেকে তেমন কিছু চোখে পড়ে নি। তবু বলা যায় না। তিনি আগে থেকেই সাবধান। সেদিন থেকে জানলায় পর্দা টানিয়ে দিয়েছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই স্কুল ছাড়িয়ে এনেছিলেন শান্তিকে। মাষ্টাররা আপশোষ করেছিলেন: অমন একটা মেয়ের জীবনে এত তাড়াতাড়ি ইতি টানা হয়ে গেল এমনি করে—

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে, রাত্রির এই শান্ত পরিবেশে, নভেম্বরের মধ্যরাত্রে, শীতের শিরশিরানিতে মশারীর মধ্যে কুঁকড়ে-শুয়েথাকা শান্তিকে অদ্ভুত কচি আর শিশু বলে মনে হল। মনে হল সব তিনি ভুল করেছেন। তেমন কিছু করার মত গভীর বয়েস হয় নি শান্তির। আলোটা নিবিয়ে শুতে শুতে একবার মনে পড়ল খোকার কথা। এখন কত রাত? কানের কাছে বেজে উঠল টেলিপ্রিণ্টারের বিরাট গর্জন। খোকা কি এখনও রাত জেগে খবর লিখছে?

সকালে উঠে কাজের অন্ত নেই। রাতের বাসি কাপড় ছেড়ে উনুনে আঁচ দিতে হয়। খোকা তার অনেক আগেই এসে পড়ে। তারপর শুয়ে থাকে খানিকটা। ভাল করে রোদ উঠলে ইন্দুপ্রভা চা নিয়ে ডাকেন: খোকা ওঠ চা এনেছি।

ততক্ষণে অপিসের পিওন কাগজ দিয়ে যায়। তাই নিয়ে রোদের সামনে বসে খবর পড়ে খোকা।

মাঝে মাঝে অবাক হন ইন্দুপ্রভা। খোকা নিজে এতো খবর লেখে রাত জেগে, তারপর এত খবর পড়ে কি করে? শুধু মাঝে মাঝে বলেছেনঃ খোকা, চেহারাটা তেমন ভাল ঠেকছে না। শরীরের দিকে একটু নজর রাখ।

একটু হেসেছে খোকা। বলেছে: ভালই ত আছি মা, তুমি মিথ্যে ভাবছ।

তারপর সারাদিনে কাজকর্মের বিরাম নেই। মাঝে মাঝে চোখে পড়েছে—শান্তিটা এখানে ওখানে ছোটাছুটি করছে ছেলেমানুষের মত। একসময় সুবিধে পেয়ে জিগ্যেস করেছিলেন ইন্দুপ্রভাঃ হ্যাঁরে শান্তি কি কাপড়ের কথা বলছিলি না?

হঠাৎ যেন অবাক হল শান্তি। তারপর আস্তে আস্তে বলল: আমার কাপড় চাই না মা। ভয়ে ভয়ে তাকালো মায়ের দিকে।

এবার ইন্দুপ্রভা বুকের কাছে টেনে নিলেন শান্তিকেঃ রাগ হয়েছে বুঝি আমার ওপর? না তোমার কাপড় কিনে দেব এবার। কি কাপড়ের নামটা বলছিলে যেন?

—আলোছায়া শাড়ী, ওই যে একটু—থামে শান্তি। তাকায় ইন্দুপ্রভার দিকে।

ইন্দুপ্রভা সন্দেহে হাসছেন মৃদু মৃদু।

—সেই যে গো মেয়েটা এসেছিল, ওই যে পাশের বাড়ীতে থাকে—আদর পেয়ে হঠাৎ যেন মুখর হয়ে উঠল শান্তিঃ সেই মেয়েটা কিনেছে, আমায় তুমি কিনে দেবে অমন কাপড়?

—দেব রে দেব। নিজের সঞ্চিত টাকা কটার কথা মনে পড়ল।

সংসারের অফুরন্ত চাহিদার মধ্যেও যা খরচা করেন নি এতদিনঃ হ্যাঁরে জিগ্যেস করেছিলি কত দাম? কোথা থেকে কিনেছে?

—না তাত জিগ্যেস করিনি। নিজেই যেন ঠকে গেল এমনি স্বরে কথা বলল শান্তি : জিগ্যেস করে আসব?

—আচ্ছা দুপুরবেলা জিগ্যেস করে আসিস। সন্ধ্যাবেলা খোকার কাজে যাবার সময় কিনতে দেব এখন—

তারপর সারাটা দিন কোথা দিয়ে গড়িয়ে গেল। দুপুরের কাজকর্ম সেরে একটু রোদে বসেছেন ইন্দুপ্রভা। শীতের রোদের আমেজে চোখ জড়িয়ে আসছে। খোকা ঘুমুচ্ছে। আজও নাইট ডিউটি। আর শান্তি বোধহয় বন্ধুর বাড়ী গেছে কাপড়ের দাম জানতে।

তারপর রোদ পড়ে আসে। বেলা গড়িয়ে যায়। ঝি আসে দুপুরের এঁটো বাসন নিয়ে যায় কলতলায়। গা ঝেড়ে উঠে পড়েন এবার ইন্দুপ্রভা। গা ধুতে যেতে হবে। তারপর হেঁসেলে গিয়ে রান্না খাওয়া, আবার ফিরতে ফিরতে রাত সেই গভীর হয়ে আসবে। প্রত্যেকদিনের পুনরাবৃত্তি। মেয়েটা এখনও এল না ত?

শান্তি এল এক সময়ঃ মা জিগ্যেস করেছি দাম। কেমন খুশী খুশী স্বর গলার।

—কত? অবহেলায় জিগ্যেস করলেন ইন্দুপ্রভা : বল না দামটা?

—বাহান্ন টাকা আট আনা। ওরা তো কেনে নি—দিদির কে একজন বন্ধু নাকি দিয়েছে। খুব বড় লোক কিনা।

প্রথমে চট করে উত্তর দিতে পারলেন না ইন্দুপ্রভা। বাহান্ন টাকা আট আনা। নিজের সঞ্চিত সমস্ত টাকাও যে এর কাছাকাছি গিয়ে পৌছতে পারবে না।

মায়ের অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তি বললঃ না মা আমার অত টাকা দামের শাড়ী চাই না। তার চেয়ে কম দামের একটা কিনে দিও।

কিন্তু হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ইন্দুপ্রভার চোখ। হ্যাঁ, মনে পড়েছে—মেয়েটাত একদিন বলেছিল তার বাবা নেই। দুঃখে মনটা কেমন হয়ে গেছল। জিগ্যেস করেছিলেন : হ্যাঁ মা তোমার দাদা আছে বুঝি? সেই বুঝি চাকরী-বাকরী করে?

মেয়েটা অবাক হয়ে বলেছিল : আমার দাদা নেই—

কষ্টে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল ইন্দুপ্রভার। বলেছিলেন : আহা বাছারে তাহলে ত তোমাদের ভীষণ কষ্ট। নিজে জানেন তিনি, খোকা যতদিন চাকরী পায়নি ততদিন কত কষ্টে চলেছে। তেল আনতে নুনটা ফুরিয়েছে, নুন আনতে ভাত। তবে তোমাদের সংসার চলে কি করে?

—কেন, দিদি চাকরী করে। আমাদের ত কোন কষ্ট নেই। এই ত সেদিন দিদি আমার পুরানো হারটা ভেঙে নতুন হার গড়িয়ে দিলে। এবার হাতের বালা ভেঙে নতুন প্যাটার্ণের একটা গড়িয়ে দেবে। আচ্ছা মাসীমা—আত্মীয়তায় কাছে আরো সরে এসেছে মেয়েটাঃ এবার শান্তির চুড়ি কগাছা পালটে দিন না কেন। আমরা দুজনে একই রকমের তৈরী করাবো।

এবার আর সমীহ না করে পারেন নি ইন্দুপ্রভা। আত্মীয়তার সুরে বলেছেন : হ্যাঁ, মা তোমার দিদি বুঝি খুব বড় চাকরী করে? অনেক টাকা মাইনে পায়?

একটু হেসে মেয়েটা বলে : তা এমন বেশী না, শ' আড়াই তিন হবে। দিদি যে বড়সাহেবের প্রাইভেট ষ্টেনো—চিঠি ছেপে দেয়। তা ছাড়া রোজ গাড়ী পাঠিয়ে দেয় বেড়াবার জন্য।

এর পরে আর কিছু বলতে পারেন নি ইন্দুপ্রভা। পরে খোকাকে জিগ্যেস করে ছিলেন : হ্যাঁরে মেয়েরা আজকাল অনেক টাকা রোজগার করে?

—তা করছে বৈ কি। লেখাপড়া শিখলে করবেই বা না কেন?

—জানিস—ইন্দুপ্রভা ঝুঁকে পড়লেন আরো কাছে: ওই যে মেয়েটা আসে আমাদের শান্তির কাছে ওরই দিদি মাসে আড়াই শ' তিন শ' টাকা রোজগার করে। সাহেবের কাজ করে। চিঠি লেখে।

—ওঃ, হাসল খোকা: ওর অত মাইনে নয় বড় জোর দেড়শ'—

—হ্যাঁ—। ইন্দুপ্রভা জোর দিয়ে বললেন: সবাই তোর মত কিনা একশ', দেড়শ' রোজগার করতে বুড়ো হয়ে যাবে। জানিস ওকে সাহেব নিজে গাড়ী পাঠিয়ে দেয়।

—তা দেবে না কেন মা? হঠাৎ কি কঠিন মনে হল খোকার গলার স্বর একটু শ্লেষাত্মক: আমি মেয়ে হলে অনেক বেশী রোজগার করতে পারতাম মা। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।

তখন অনেকক্ষণ ছেলের মুখের দিকে চেয়েও বুঝতে পারেন নি মনে হয়েছিল খোকার এ অভিমান। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনে হল খোকার কথাগুলোর অর্থ অতি সহজ আর সরল।

অবশ্য খোকার রোজগার দেড়শ' টাকা থেকে দুশ'তে উঠল: তারপর আড়াইশ'—টাকাও এনে দেয় মায়ের হাতে। দুটো টিউসানি আর নোট লিখে এই বাড়তি রোজগার করেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ভারী ভয় করে ইন্দুপ্রভার। প্রথম শীতের শিরশিরানির মত একটা আতঙ্ক সারাটা শরীরে পাক দিয়ে ওঠে। মনে পড়ে ব্রজবল্লভ এমনি করেই রোজগারের টাকা ধাপে ধাপে বাড়িয়েছিলেন। তারপরে একদিন হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। হুলুস্থুল ব্যাপার। ডাক্তার এসে বললেন: ব্লাড প্রেসার। ফুল রেষ্ট। কেয়ারফুল ডায়েট। কিন্তু পঁয়তাল্লিস ইঞ্চি বুকের তলায় কোথায় যে ঘুণ ধরেছিল কেউ জানতে পারেনি। তারপর আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেননি ব্রজবল্লভ। সে বাড়ী ছেড়ে আজ এ বাড়ীতে উঠে

এসেছেন ইন্দুপ্রভা। কয়াবর্ত্তীত পরিবার অনেক আগেই ভেঙ্গে ছত্রখান হয়ে গেছে। সে বাড়ীতে ব্রজবল্লভের স্মৃতি পাগল করে তুলেছিল ইন্দুপ্রভাকে। তারপর খেয়ে না খেয়ে ছেলেকে পড়িয়ে মানুষ করেছেন। সংসারের ব্যয় সংকোচ করে ক্রমশঃ শীর্ণ করেছেন। এক জায়গা ছেড়ে আরো সস্তায় অন্য জায়গায় উঠে গেছেন। তারপর খোকা বড় হয়ে লেখাপড়া শিখেছে। আর আজ—একটা নিশ্বাস ফেলেন ইন্দুপ্রভা। অসীম স্নিগ্ধতায় প্রাণমন ভরে ওঠে। তার কর্তব্য তিনি পালন করেছেন;

অর্ধেক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল ইন্দুপ্রভার। কারা যেন দরজায় কড়া নাড়ছে। ঠেলে ওঠালেন শান্তিকে। কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। কে জানে কি হয়েছে?

ধড়মড় করে উঠে বলল শান্তি: কি—কি হয়েছে মা!

কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন ইন্দুপ্রভা: নীচে কারা যেন ডাকাডাকি করছে। তুই জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দেখত?

জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দেখল শান্তি, দাদা আর একজন কে এসেছে রিক্সা করে।

তারপর দুজনে গা ঘেঁসাঘেঁসি করে সদরে এসে দাঁড়াল। মনে মনে বিড়বিড় করে কি বকাতে থাকেন ইন্দুপ্রভা। আর দরজার খিল খোলে শান্তি। একজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরে ঢোকে খোকা। ইন্দুপ্রভা চেঁচিয়ে ওঠেন: কি হয়েছে খোকা?

এরপরে ডাক্তার এলেন। সমস্ত দেখে শুনে বললেন: একবার বুকের প্লেটটা নিতে হয়। লাঙসে দোষ পাচ্ছি যেন।

বোবার মতন তাকিয়ে থাকেন ইন্দুপ্রভা অর্থহীন দৃষ্টি নিয়ে।

ডাক্তার আবার বলেন: ভাবনার কিছু নেই তবে—

তবে ডাক্তার আশ্বাস দিয়ে গেলেন। প্লেট নেওয়া হল: ঘাবড়াবার

কিছু নেই। সবে এ্যাটাক করেছে। ট্রিটমেণ্ট করলেই আর কি—কথাটা শেষ হয় না।

ইন্দুপ্রভা কেমন বোবা চোখ চেয়ে থাকেন। কোন কথাই যেন ভাল করে কানে যায় না।

—ভাল করে ট্রিটমেণ্ট করলে সেরে যাবে। তবে স্যানিটোরিয়ামে দেওয়া ভাল। যাদবপুরেই চেষ্টা করুন। ডাক্তার চলে গেলেন।

ইন্দুপ্রভা খোকার কাছে এসে বসেন।

ম্লান হাসে খোকা: মা ভাগ্যকে কি কখনো এড়ানো যায়? কি করবে বলো?

ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন ইন্দুপ্রভা: আচ্ছা বাবা ঐ রোগের চিকিৎসা নেই কোথাও? আমি তোর চিকিৎসা করাবো?

অনেকক্ষণ কিছু কথা বলে না খোকা। চুপ করে থাকে।

ইন্দুপ্রভা আবার বলেন: বল্ বাবা এর চিকিৎসা হয় না! কত টাকা লাগে?

হাসল খোকা: হয় মা, সুইজারল্যাণ্ডে হয়।

—হয়? ইন্দুপ্রভা যেন আশার আলো দেখতে পেলেন: হয়, তবে কত খরচ?

--কত আর পাঁচ, সাতশ'! অবজ্ঞার সঙ্গে বলে খোকা। মাকে যেন প্রবোধ দিতে চায়।

মাত্র পাঁচ, সাতশ'! সেখান থেকে উঠে এলেন ইন্দুপ্রভা। হঠাৎ চোখে পড়ল জানালার পর্দা তুলে বাইরে তাকিয়ে আছে শান্তি। পাশের বাড়ীর বন্ধুটির দিদিকে কে যেন গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। এই মেয়েটা ইচ্ছে করলেই কত সহজে পাঁচ, সাতশ' টাকা রোজগার করতে পারে। মনে পড়ল ব্রজবল্লভের কথা—আকণ্ঠ ঘৃণায় সারাটা শরীর ঘিন্‌ঘিন্ করে উঠল ইন্দুপ্রভার। শান্তির গালে একটা চড়

কসালেন ঠাস করে। অবাক হয়ে পর্দাটা টেনে দিতে যচ্ছিল শান্তি— কিন্তু তার আগেই পর্দাটা টেনে খুলে দিলেন ইন্দুপ্রভা। শান্তিকে আরো অবাক করে দিয়ে বললেন: মেয়ের লজ্জা দেখ না? ন্যাকামি দেখলে গা জ্বলে যায়! এত বুড়ো হয়েছ ফ্রক পড়ে ঘুরতে লজ্জা করে না? আজকেই শাড়ী কিনে আনব দাঁড়াও। একবার বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলেন। কাউকে যেন প্রত্যাশা করছিলেন। চোখে পড়ল গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে তখনো!

হঠাৎ মনে হল· শাড়ী পরলেই কি বড় হয়ে উঠবে শান্তি, সমান হয়ে উঠবে ওই মেয়েটার মত? না, কবে সত্যি বড় হবে শান্তি? কত-দিনে পাঁচ, সাতশ' টাকা রোজগার করবে? ততদিন খোকা বেঁচে থাকবেত স্যানিটোরিয়ামে যাবার জন্য? চোখের সামনে ঘুণের পোকাগুলো কিল্‌বিল্‌ করে উঠল। চোখ বুঝলেন ইন্দুপ্রভা

[illegible]

পাঁচ বছরের মধ্যে কোনদিন এরকম ব্যতিক্রম ঘটেনি অথবা ঘটেছে কিনা মনে পড়ে না উমানাথের। দোর্দণ্ড প্রতাপে একদিন দশবিশটা গ্রামের হর্তা কর্তা বিধাতা ছিলেন তিনি আর আজ অথর্ব হয়ে গেলেও সে দাপট কমেনি একবিন্দুও। সারাটা বাড়ী সন্ত্রস্থ হয়ে ওঠে হাঁক ডাকে। কি ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে তাঁর অথচ আটটা কি আর বাজবে না নাকি? সাদা দৃষ্টিহীন চোখ দুটো তুলে একবার দেওয়ালের চারিদিকে ঘুরিয়ে নিলেন। না বৃথা—কোথায় ঘড়ি তার খেয়াল নেই। না ঘড়িটাই বোধ হয় বন্ধ হয়ে গেছে। কি হয়েছে আজ বাড়ীর কে জানে? ছেলে বেলা থেকে ভীষণ পেটুক তিনি। আর বুড়ো বয়সে ক্ষিদে যেন আরো বেড়েছে বলে মনে হয়: অ্যাই কৌন হ্যায়—কে আছিস রে? আমার ওভালটিন্—ওভালটিন্ কোথায়? এই গিরিধারী—

বাইরে থেকে কারো সাড়া পাওয়া যায় না। কেমন যেন অস্বাভাবিক নীরবতা বাড়ীটার আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন উমানাথ। কেমন যেন অসহায় বলে মনে হল নিজেকে—কান্না পেতে লাগল তাঁর। এবার একটু জোরে গলা ছেড়ে ডাকলেন উমানাথ: ও ছোট বৌমা, আমার ওভালটিন্—আমি কি না

খেয়ে থাকব নাকি? কি হচ্ছে তোমাদের—ভারী অসহায় শোনাল উমানাথের কণ্ঠস্বর। কেমন যেন কাঁদ কাঁদ ভাব, একটা জেলার দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা যার দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল নয় খাক্, গুণ্ডা বদমাসেরা থরথর করে কাঁপত। তাঁকে আজ আর চেনবার উপায় নেই। পূর্ব জীবনের প্রেতাত্মা উমানাথ।

শেষকালে গিরিধারী আসে: বাবু আপনার ওভালটিন্—

উত্তর দিলেন না উমানাথ। অভিমানে, অপমানে রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ।

গিরিধারী আবার বলে: বাবু—

—আমি খাব না, নিয়ে যা হারামজাদা, বললেন উমানাথ।

—ছোট বৌদি যে পাঠালেন আপনার জন্যে।

এবার ভীষণ চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি: নিয়ে যা বলছি হারামজাদা, শিগগির নিয়ে যা—আর বলগে খাবে না—বাবু খাবে না! এতক্ষণ কি হচ্ছিল শুনি? জানিসনা আমি আটটায় ওভালটিন্ খাই। এতক্ষণ পরে ইয়ার্কি দিতে এসেছিস উল্লুক। যা বেরিয়ে যা—আমি খাব না—উমানাথ উন্মাদ হয়ে যান ক্রোধে: অ্যাঁ, এরা আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না—থরথর করে কাঁপতে থাকেন উমানাথ।

ছোট বৌ মল্লিকাকে গিয়ে খবর দেয় গিরিধারী: ছোট বৌদি বাবুত খেলেন না—

—কেন? অবাক হল মল্লিকা।

—ভীষণ রাগ করেছেন। ওভালটিন কিছুতেই খেতে চাইলেন না। বলছেন আমি আটটার সময় ওভালটিন্ খাই ত এত দেরী হল কেন? এতক্ষণ সবাই কি করছিল?

বাধ্য হয়ে এবার মল্লিকাকে নিজেই আসতে হল: বাবা আপনার ওভালটিন নিন—

কোন উত্তর দিলেন না উমানাথ। ঘড়িতে এমন সময়

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে লাগল। কান পেতে শুনতে লাগলেন উমানাথ।

—বাবা এটা খেয়ে নিন—

এবার খেঁকিয়ে উঠলেন উমানথ: না খাব না। আটটার সময় খাবার কথা আর এখন নটা বেজে গেল। এতক্ষণে বিবিদের হুঁস হল? একটা বুড়ো অথর্ব সারাটা দিন না খেয়ে রইল, কারুরই খেয়াল নেই তাতে।

আস্তে আস্তে মল্লিকা বলল: একটু দেরী হয়ে গেল আজ—

—একটু দেরী? একঘণ্টা দেরী—এরকম করে আমি আর বাঁচব না—ডাঃ রায় কি বলেছিলেন তোমার মনে নেই? ইন্ টাইম্ সব খেতে হবে—মনে নেই তোমার?

—মনে আছে বাবা। মল্লিকা বলল: বাড়ীতে কদিন কাজ পড়েছে ভীষণ, মানে—ঢোঁক গেলে মল্লিকা।

—আমার এটা বুঝি আর কাজ নয়? কি কাজ ছিল শুনি?

এবার আর উত্তর দেয় না মল্লিকা।

—কি শুনতে পাচ্ছনা বৌমা—আমি জিগ্যেস করছি শুনতে পাচ্ছনা? কি এমন কাজ ছিল তোমাদের যে আমার খাবার কথা মনে নেই।

—কদিন ধরে—ঢোঁক গিলল মল্লিকা: মানে—মেজদার ভীষণ অসুখ আর কি মানে—আবার ঢোঁক গিলল মল্লিকা।

কেমন বিস্মিত হয়ে যান উমানাথ: কার অসুখ, শিবনাথের? জানি হবে—আমি জানি। সময় মত খাবে না ডাঃ রায় কি বলেছিলেন তোমার মনে নেই মল্লিকা—দেখি ওভালটিনটা দাও। একদিন একটু দেরী করে খেলে কি এমন ক্ষতি হবে বলত?

মল্লিকা বলে: না তা আর কি হবে এমন—আপনি খেয়ে নিন।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলেন উমানাথ : সেই ভাল—সেই ভাল। কে দেখছে, ডাঃ রায় দেখছেত ? ডাঃ রায়কে কল্ দাও।

—হ্যাঁ, উনি দেখছেন। বলে চলে যায় মল্লিকা।

আপন মনে বিড়বিড় করে বকেন উমানাথ : জানি হবে—হতে হবে। সময় মত না খেলে, নিয়ম মত না চললে কি চলে ? জানি এমন হবে। বকতে বকতে অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবেন উমানাথ, কত বছর বয়েস এখন হল তাঁর ? বাহান্ন বছর বয়সে রিটায়ার করেছেন। তারপর আর কটা বছর গেছে কে জানে। রিটায়ার করার পর দুটো বছর মাত্র চোখে দেখতে পেতেন। তারপর আস্তে আস্তে দৃষ্টিশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। একেবারে অন্ধ হয়ে গেলেন তিনি। ছেলেরা অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি—। উপযুক্ত ছেলেরা, তিন ছেলেকেই মানুষ করেছেন উমানাথ। সেদিক দিয়ে পিতৃভাগ্য ভাল উমানাথের।

তবুও কিছুতেই কিছু হল না। এতে একটুও দুঃখিত নন উমানাথ। চুয়ান্নটা বছরত চোখ দিয়ে পৃথিবীকে উপভোগ করেছেন—তারপর নাইবা রইল চোখ তাঁর—বেঁচে আছেন তাতেই যথেষ্ট। তাতেই সুখী উমানাথ। মৃত্যু—মৃত্যুকে ভারী ভয় তাঁর। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হেরে গেছেন উমানাথ।

মস্ত বড় একটা ডাকাতি কেসের আসামীদের সংরে চালান করে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরছিলেন উমানাথ। সবাই বারণ করেছিল: আজ আর রাত করে যাবেন না স্যার—যে দিন কাল, তারওপর এ কেসের সবাই ধরা পড়েনি এখনো—

তখন ভয় কাকে বলে জানতেন না উমানাথ। হেসে উড়িয়ে দিলেন তিনি : কত রাতই বা হয়েছে—বারোটার মধ্যে ঠিক বাড়ী পৌছে যাব।

বাড়ী পৌছেছিলেন ঠিকই অবশ্য, তবে উমানাথকে চেনবার আর উপায় ছিল না। মাঠের মধ্যে প্রহার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কারা

যেন ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে, চাবুক দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল ঘোড়াটাকে। অনেক দিনের পুরনো ঘোড়া বাড়ীর পথ ঘাট সব চেনা। অর্ধমৃত উমানাথকে নিয়ে ঘোড়া ঠিকসময়েই এসেছিল। পাকা ছটি মাস হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কাটাতে হয়েছিল। আজও মনে পড়ে তার। তারপর রিটায়ার করলেন উমানাথ। শঙ্করদের মা বলে-ছিলেন: আর ও সাংঘাতিক চাকরী করে দরকার নেই। যা জমেছে এ কবছরে তাতেই যথেষ্ট। তার ওপর ছেলেরা মানুষ হয়েছে, ভাবনা কি!

এতদিন পরে হঠাৎ মনে হল উমানাথের, না, আর সময় নেই। শিবনাথ অসুখে ভুগছে, কেমন আছে কে জানে? মারা যাবে না তো? তার চেয়ে আমার যেন আগে মৃত্যু হয়! তারপর আস্তে আস্তে বলেন: না না আমি মরতে চাই না—আমি চাই বাঁচতে। বলতে বলতে গলা শুকিয়ে আসে তাঁর। বুকটা ধরফর করে ওঠে। বলেন তিনি: ছোট বৌমা, বলি ও ছোট বৌমা—নাঃ গেল কোথায়। আমার ওপর কি কারো দয়া আছে না মায়া আছে—

মল্লিকা কাছেই হয়ত কোথাও ছিল। এসে জিগ্যেস করল: কি বাবা?

—এই যে ছোট বৌমা আমার শরীরটা কেমন ভাল ঠেকছে না। বুকের ভেতরটা কেমন করছে যেন। একবার বুকে হাত দিয়েই দেখনা—

মল্লিকা উমানাথের বুকে হাত দিয়ে দেখল, হার্টবিটিংটা জোরে জোরে হচ্ছে। হার্ট ভীষণ উইক! এবার বলল মল্লিকা: পাখার হাওয়া করি কেমন, আপনি একটু শুয়ে পড়ুন।

উমানাথ শুয়ে পড়লেন বিনা দ্বিধায়। বললেন: হাওয়া করো—জোরে জোরে হাওয়া করো। হঠাৎ ফিস্‌ফিস্ করে জিগ্যেস করলেন উমানাথ: শিবনাথ কেমন আছে? বাঁচবে তো অ্যাঁ? ডাঃ রায়কে একবার খবর দাও, দেখে যাক। চিকিৎসা করাও—ভাল করে চিকিৎসা

করাও। যেন কিছু না হয় ওর—যেন কিছু না হয়। তার চেয়ে আমি যেন মরি আমার তো অনেক হল—

—না না সে কি বলছেন, আপনার কিছু ভয় নেই। মেজদা ভালই আছেন, ডাঃ রায় এসে দেখে গেছেন। বলেছেন, কোন ভয় নেই। আবার আসবেন, আপনি শুধু শুধু নার্ভাস হবেন না আপনার চেয়ে আরো কত বুড়ো বেঁচে আছেন এখনো। আমার দাদামশাই ত পঁচানব্বুই বছর বেঁচে ছিলেন আর আপনার ত মাত্র পঁয়ষট্টি। সমস্ত চুল এখনো পাকেনি।

নিজের অজান্তেই মাথার চুলে হাত দিয়ে অনুভব করতে লাগলেন উমানাথ। পরে বললেন: ডাঃ রায় এলে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিও ত। আমাকে একবার যেন দেখে যায়। একটা প্রেসক্রুপ্‌সন করিয়ে নিতে হবে। ভারী ভাল প্রেসক্রুপস্‌ন করেন ডাঃ রায়।

বাইরে একটা অস্পষ্ট গোলমাল শোনা গেল। উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল মল্লিকা, কি ব্যাপার? কি হল আবার বাইরে?

উমানাথও যেন খেয়াল করলেন এতক্ষণ পরে: বাইরে যেন একটা কিসের গোলমাল শোনা যাচ্ছে বৌমা?

মল্লিকা বলল: হ্যাঁ, একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছে যেন! যাই দেখে আসি—বলে বেরুতে যাচ্ছিল মল্লিকা।

এমন সময় গিরিধারী এসে বলল: ছোট বৌদি শিগ্‌গির একবার একতলায় যাও।

চমকে উঠল মল্লিকা: কেন? কি হয়েছেরে গিরি?

—ছোট খোকা ওপর থেকে পড়ে গেছে। মাথা ফেটে—আর কি বলতে যাচ্ছিল গিরি।

অন্ধ চোখ দু'টো ঘুরিয়ে তাকালেন উমানাথ: কি হয়েছে? কি হয়েছেরে গিরি? অ্যাঁ কি হয়েছে বৌমা?

আবার কি যেন বলতে যাচ্ছিল গিরিধারী—ধমকে উঠল মল্লিকা : কি বাজে বকছিস। যা বাবার কাছে বোস। আমি একবার নীচে যাচ্ছি। দুপা এগিয়ে আবার ইশারায় বলল : বাবাকে যেন কিছু বলে ফেলিসনে খবরদার। নীচে যাবার আগে মল্লিকা তাকিয়ে দেখে গেল উমানাথকে।

আশ্চর্যরকম গম্ভীর। হয়ত কিছু আঁচ করতে পেরেছেন। কি একটা অদমিত কৌতুহল। উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে মুখ। নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। শাদা চোখের মণিতে কি একটা অসহায় দৃষ্টি—যেন উমানাথ বুঝতে পেরেছেন আর সময় নেই, মৃত্যু তাঁর শিয়রে। মৃত্যুর সামনে ভারী অসহায় বলে মনে হতে লাগল তাঁর। না আর ভাবতে গেলে হয়ত উন্মাদ হয়ে যাবেন তিনি। চারদিকে খালি মৃত্যু আর তার অস্পট সংকেত। অনেকক্ষণ ভেবে শেষকালে ডাকলেন উমানাথ : এই গিরীধারী?

—বাবু। মাথা চুলকোয় গিরিধারী।

আস্তে ডাকলেন উমানাথ : এই শোন, আয় এদিকে। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বললেন : কি হয়েছে রে? বৌমা এত দেরী কচ্ছে কেন রে? কিছু হল নাকি?

—না না। জিভ কাটল গিরিধারী : তেমন কিছু নয়—

—তবে বল কি হয়েছে? উৎসুখ হয়ে উঠলেন উমানাথ।

মাথা খেলিয়ে একটা মিথ্যে কথা বলে ফেলল গিরিধারী : সেই যে ডোরাকাটা বেড়ালছানাটা ওপর থেকে মানে পড়ে গেছে আর মাথাটাও নাকি ফেটে গেছে। নিজের বুদ্ধিমত্তায় নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল গিরিধারী।

চুপচাপ থেকে অনেকক্ষণ পরে মিন্‌মিন্ করে বললেন উমানাথ : ওঃ একটা বেড়াল ছানা! ওত হামেশাই হচ্ছে। তাতে আমার কি? তারপর আবার নিজে নিজেই চমকে ওঠেন, কে জানে আর কতদিন!

বয়েস ত আর নেহাৎ কম হল না—আর কত দিন—বিড়বিড় করে বকতে থাকেন উমানাথ।

বড়দি মাধবী বললেন: তুই চান করে খেয়ে নে মল্লিকা। কাল সারা রাত ধকল গেছে তোর ওপর দিয়ে।

—দিদি খোকার কি হবে?

—কি হবে আবার—ভাল হয়ে যাবে, ভয় কি। শঙ্করইত গেল সঙ্গে। যা চান করগে আমি ততক্ষণ রান্নাঘরটা ঘুরে আসি। কি যে অলক্ষ্মী লেগেছে সংসারে। একটার পর একটা লেগেই আছে। আর খেতে যাবার আগে মালতিকে সঙ্গে নিয়ে যাস। হতভাগীর কি যে কপাল করে এসেছিল। চোখ মুছলেন বড়দি: তিন কূলে কেউ নেই হতভাগীর, একটু সুখের মুখ দেখেছিল আর কপালে সইল না। খেতে যাবার সময় নিয়ে যাস জোর করে ধরে। ব্যাচারীর প্রাণ ভয়ে উড়ে গেছে। যাই আমি রান্নাঘরে, সাড়ে দশটা বাজে, এগারটায় আবার বাবার ভাত।

একাই বসে বসে ভাবছিলেন উমানাথ। শিবনাথটা অসুখে ভুগছে। কিসে ভুগছে কে জানে? বাঁচবে ত? বারবার খালি মনে হতে লাগল উমানাথের—না বাঁচবে না, শিবনাথ কিছুতেই বাঁচবে না। একবার দেখতে ইচ্ছে করে শিবনাথকে। অমন লোহার মত স্বাস্থ্য, পাথরের মত বুক হয়ত শুকিয়ে গেছে প্যাকাটির মত। হয়ত চিনতেই পারবে না উমানাথ। উমানাথের অন্ধ চোখ দুটোর সামনে ভেসে বেড়াতে থাকে শিবনাথের সবল দেহটা। মনে আছে—স্পষ্ট মনে আছে রোজ সকাল বেলা মেড়ো সেপাইগুলোর সঙ্গে কুস্তি লড়ে যখন ফিরত শিবনাথ—দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতেন উমানাথ। মনে হত শ্বেত পাথরের একটা মূর্তি হঠাৎ প্রাণ পেয়েছে। আশ্চর্য সাহস আর কর্তব্য বোধ। মনে আছে উমানাথের—কলেজ জীবনে রাতে একদিন সিনেমা

দেখতে গেছল শিবনাথ। রাত নটার শোতে। এদিকে সাড়ে বারটার কাঁটা একটায় এল কিন্তু শিবনাথ আর ফেরে না। এমন সময় হাসপাতাল থেকে খবর এল: শিবনাথ নামে এক ভদ্রলোককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আহত অবস্থায়। এখন ভাল আছে।

আশ্চর্য্য হয়ে গেছল সবাই : ব্যাপার কি?

কিন্তু তারপর দিন আরো আশ্চর্য হয়ে গেল সবাই যখন কাগজে শিবনাথের ছবির সঙ্গে খবর বেরুল : বাংলার যৌবন আজও নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। আজো তারা বেপরোয়া, দুর্জয়। গুণ্ডাদের হাত থেকে দুজন ভদ্র মহিলাকে উদ্ধার করেছিল শিবনাথ, আর তাদের ছোরার আঘাতে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে যেতে হয়েছিল তাকে। মুমূর্ষু শিবনাথ—তবুও কি ভীষণ আনন্দ হয়েছিল উমানাথের। স্ত্রীকে ডেকে বলেছিলেন : আজ আমার গর্ব হচ্ছে আমি শিবনাথের বাবা। উমানাথের মুখে হাসি চোখে জল।

সেই শিবনাথের অসুখ। ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা হলে স্পষ্ট জিগ্যেস করবেন তিনি : কি ব্যাপার? বাঁচবে ত? ভয় নেই তিনি সহ্য করতে পারবেন। মন তাঁর কঠোর—তা না হলে নির্বিবাদে ওপরওয়ালার হুকুমে নিরীহ শোভাযাত্রার ওপর গুলি চালিয়েছেন, মন টলেনি একদিনও হাত কাঁপেনি একবারও। দেখেছেন লোকগুলো মরেছে, কেমন করে তিলে তিলে মৃত্যু তাদের গ্রাস করেছে। আর তাদের বাঁচবার কি আগ্রহ চোখে মুখে ফুটে উঠেছে—কি দুর্জয় আকাঙ্খা বাঁচবার, আকাশে, বাতাসে, দেশের মাটিতে—দেখেছেন তিনি। তারি হাতের এলো পাথারি গুলিতে কত লোকের কলজে ফুটো হয়ে গেছে—তিনি দাঁড়িয়ে দেখেছেন। বাইরে জুতোর আওয়াজে চিন্তার জালটা ছিঁড়ে গেল উমানাথের। বললেন : কে? কে বাইরে?

আওয়াজটা এসে থামল ঘরের কাছে, উত্তর এল : আমি ডাঃ রায়।

—কে ডাঃ রায়? আসুন, কেমন দেখলেন শিবনাথকে?

—ভয় নেই কিছু, ভাল হয়ে যাবেন তবে এবার ব্লাড সাপ্লাই করতে হবে, তাই ভাবছিলাম কি—

উমানাথ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন : আমি কিন্তু রক্ত দিতে পারব না ডাঃ রায়। জানেন ত আমার শরীরের অবস্থা—বুকের ভেতরটা কেমন ধড়ফড় করছে, মাথা ধরছে, আমার পালসটা দেখুন একবার ডাঃ রায়।

হাত বাড়িয়ে দেখলেন ডাঃ রায় : না না ভয় নেই, নরম্যাল পালস আপনার।

—ওঃ নরম্যাল—কিন্তু আমার তেমন ভরসা হচ্ছে না। আমি বোধ হয় আর বেশীদিন বাঁচব না ডাঃ রায়, আপনি একবার ভাল করে দেখুন দেখি আমার বুকটা—

—দেখছি, ভাববেন না, 'রঙ' ত কিছুই দেখছি না।

—না না আপনি একটা প্রেসক্রুপসন করে দিন। যা সব আরম্ভ করেছে—আজই দেখুন না আটটার সময় আমার ওভালটিন ছিল দিল কখন জানেন? নটার সময় আচ্ছা বলুন ত এরকম করলে আমি কি আর বাঁচব? কিছুতেই বাঁচব না, ডাঃ রায় কিছুতেই বাঁচব না। প্রায় কেঁদে ফেললেন উমানাথ, সাদা ড্যাব ড্যাবে চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল : দেখছেন তো আমি অথর্ব হয়ে পড়েছি কারো একটু দয়া নেই, কারো কোন দায়িত্ব নেই—একটা প্রেসক্রুপসন লিখে দেবেন দয়া করে—

ডাঃ রায় চলে গেলে চুপ করে বসে রইলেন উমানাথ।

এখনই হয়ত গিরিধারী আসবে, চান করাতে নিয়ে যাবে। যাক আর ভয় নেই ডাঃ রায় ত প্রেসক্রুপ্সন লিখে দিয়েছেন ভাল দেখে

একটা টনিক খেলে চলবে। কিন্তু শিবনাথ যদি না বাঁচে তার থেকে—মনে মনে একবার আওড়ালেন উমানাথ : আমি যেন মরি আর শিবনাথ বাঁচুক বয়েস তো তার বেশী হয়নি। আবার ভাল হোক— শিবনাথ বেঁচে উঠুক। রক্ত দিতে হলেও দেবেন তিনি, যদি শিবনাথ বাঁচেত রক্ত দেবেন তিনি।

ভাত খাচ্ছিলেন উমানাথ, সাদা ফুরফুরে আতপ চাল আর মাছের ঝোল। মল্লিকা দাঁড়িয়ে তদারক করছিল। কে যেন এসে ডাকল : ছোট বৌদি শিগ্‌গির একবার মেজদার ঘরে যাও।

—সে কি? কেন?

—মেজদা যেন কেমন করছে।

—সর্বনাশ। দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল মল্লিকা। যাবার আগে উমানাথকে কিছু বলে যেতে ভুলে গেল। হঠাৎ উমানাথের কানে এল কান্না যেন কাঁদছে।

—কে কাঁদে? তবে কি—উমানাথের মনে সন্দেহ হল। ডাকলেন : ছোট বৌমা অ ছোট বৌমা! কেউ সাড়া দিল না।

তবে কি—শিবনাথের কিছু একটা খারাপ হল—। তাড়াতাড়ি ঝোলমাখা ভাতগুলো গিলতে লাগলেন গোগ্রাসে। হয়ত মল্লিকা এখনি এসে যাবে কোন খারাপ খবর নিয়ে। তাহলে হয়ত আর খাওয়াই হবে না।

বিবর কন্দর

মাঝে মাঝে যামিনী যেন দার্শনিক হয়ে ওঠে। ভাবে এই জীবন—একটা কঠিন গণ্ডির নির্দিষ্ট সীমানাটানা পাষাণপ্রাচীরের মত বিশাল আর কঠিন, রুক্ষ আর দুর্গম। কিছুতেই বেরুবার উপায় নেই—একটা নির্বিষ আক্রোশে মাথা ঘুরতে থাকে। সারাটা মন—শুধু একটা নিষ্ফল রক্তপাত শুধু—

ঘড়ির কাঁটায় কখন জমে উঠেছে সময়। নির্দিষ্ট গতিতে গড়িয়ে চলে কাঁটাটা ডায়েলের ওপরে হামাগুড়ি দিয়ে। ক্রমে ক্রমে বেলা বেড়ে উঠেছে। তেতে উঠেছে পেভমেণ্ট। একটা অসহ্য বিরক্তিকর গুমোট।

—কটা বাজে মশাই? যামিনী প্রশ্ন করে।

মুখের সিগারেটের একটা হাল্কা ধোঁয়া ছাড়েন ভদ্রলোক! এক-টুকরো কুয়াশা আশ্চর্য সাদা আর তার একটা কুটিল সর্পিল গতি—পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠে সামনের দিকে। অদ্ভুত লাগে যামিনীর।

সুন্দর ফর্সা আর মেয়েলি কব্জির ওপর এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন ভদ্রলোক তারপর একটু অদ্ভুতভাবে জুড়ে দিলেন কথাগুলো: স' এগারোটা।

মনে মনে হিসেব করে যামিনী—বাড়ী থেকে বেরিয়েছে তা প্রায় আটটায়, ওখান থেকে বিনয়ের কাছে—তা হবে। চা খেতে তা ঘণ্টাখানেক কাট খড় পোড়াতে হয়েছে। ইচ্ছে করে—কি যে ইচ্ছে করে ভেবে পায় না। শুধু নিজে নিজে দাঁত কড়মড় করে। আর ঠোঁট কামড়ায়। একটা লজ্জা, একটা ঘেন্নার ভাব বার বার চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। মাঝে মাঝে কান্না পায় যামিনীর। চোখের কোণা কেমন জ্বালা করতে থাকে। আর একটা অর্থশূন্য বোবা কান্নার ভাব হৃদয়ের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে ঘা দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেজে ওঠে। তখন পাগল হয়ে যায় সে। একটা খ্যাপা আক্রোশে বুদ্ধিহীন শূন্যতায় হাতড়ে ফেরে তার অহংকারী শত্রুদের।

আরো অনেকক্ষণ মিছিমিছি ঘোরাঘুরি করে যামিনীকিশোর। অনেকক্ষণ ধরে। একবার এপাশে একবার ওপাশে যায়। শো-কেশ-গুলো দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দেয়ালে টাঙানো ইংরেজী নভেলগুলো দেখে খুলে খুলে। তারপর আরো যতক্ষণ না সূর্য মাথার ওপরে এসে হাঁপ ছাড়ে, পথে মানুষের ভীড় আসে কমে, নেড়ী কুকুরগুলো পথের ধারে নিশ্চল গাড়ীগুলোর তলায় ঝিমিয়ে পড়ে আর ট্রামের ঘণ্টা দুপুরের নিস্তব্ধতা ভেঙে বিরাট আকাশচুম্বী বাড়ীগুলোর মাথায় আর কার্নিশে আছড়ে পড়বে, জানালায় আর দরজার খস্‌খসে কুলিরা ঢালবে জল তখন গুটিগুটি চোরের মতন ফিরবে যামিনীকিশোর পায়ের ছেঁড়া চটিজোড়া যথাসম্ভব নিস্তব্ধতায় ডুবিয়ে—

তারপর প্রত্যেক দিনকার একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি।

রোদে আঁচল পেতে শুয়েছিলেন মা। চোখ না খুলেই বললেন: তোর এত দেরী কেনরে যামিনী?

কোনদিনই উত্তর দেয় না যামিনীকিশোর। এর কোন উত্তর নেই অন্ততঃ যামিনীর কাছে। এ প্রশ্নের কোন উত্তর হয় না। মুখ বাড়িয়ে

একবার ঘরের দিকে তাকায় তারপর আস্তে আস্তে ফিসফিসিয়ে বলে: নলিনী ঘুমিয়েছে?

—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ। তোর কথা জিগ্যেস করছিল বারবার তারপর প্রায় বিড় বিড় করে বললেন: হ্যাঁ, অনেকবার—হাজার হোক ছেলেমানুষত বুঝতে চায় না।

চলে যেতে যেতে একবার ফিরে দাঁড়াল যামিনীকিশোর। তারপর আবার গুটি গুটি হয়ে কাছে এল মার: কিছু বলছিল—কিছু বলছিল নলিনী? মানে—

মনে পড়ে মিথ্যে আশ্বাসে প্রলোভিত করে গেছে যামিনী নলিনীকে। বলে গেছে, এনে দিয়েছে তার ওষুধ—যে-ওষুধ খেয়ে ভাল হবে সে, যে-ওষুধে আবার আগের মত জোর আসবে গায়ে, আগের মত টকটকে চেহারা হবে। যামিনীর মনে হয় নলিনী যেন আস্তে আরো তার নিজস্ব ভঙ্গিতে ফিস্‌ফিস করে কথা বলছে! ঘুমোয়নি। ওঘরে নলিনী ঘুমোয়নি। শুধু শরীরটাকে শুইয়ে রেখেছে বিছানায়। একটা শুকনো আর সরু হাড়ের ওপর পাতলা চামড়ার আস্তরন। তার একটা বিরাট মাথা আর একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চোখ—তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ আর সুদূরপ্রসারী। বাড়িটার সমস্ত জাগায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—

মা বকে চলে সেই একঘেয়ে সুরে বুড়োটে গলায়। কাপড় ছেঁড়া ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজে: হাজার হোক ছেলে মানুষত বোঝে না—

একবার জোরে চেঁচিয়ে উঠিতে ইচ্ছে করে যামিনীকিশোরের। কঠোর স্বরে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করে: কেন তোমার নলিনী বড় হয় না? কেন বুঝতে শেখে না? কেন? কেন? সে ভাবে বুঝি আরো অনেকদিন বাঁচবে। আবার গায়ে জোড় হবে, হাড় পুরু হবে, রক্ত হবে টক্‌টটে লাল।

সে ইচ্ছের গলাটিপে হত্যা করে যামিনীকিশোর, সামলায় নিজেকে।

একটু জোরে শব্দ করলে উঠে বসবে নলিনীকিশোর। জিগ্যেস করবে: দাদা ওষুধ পেলে?

আবার তেমনি নির্জলা মিথ্যে কথা বলতে হবে অকাতরে: দোকানই খুঁজে পেলাম না ভাই—

—দোকান পেলে না? ওষুধের দোকান পেলে না সেই যে—নলিনী-কিশোরের চোখের সামনে ভাসতে থাকে—গলিটা পেরিয়ে তারপর ট্রাম রাস্তাটার গায়ে কত দোকানপাট সেখানে ওষুধের দোকান নেই? অবিশ্বাসের সুরে বলে: তুমি ভাল করে খুঁজে দেখছ ত দাদা? সেই ট্রামরাস্তায় কত দোকান—

—ও হরি—অবাক হয় যামিনীকিশোর। না-পাওয়ার ভান করে: আচ্ছা ভাই কালকে সকলের আগে ওখানে যাব। ওখানে অত দোকানপাট আর ওখানে কি একটা ওষুধের দোকান থাকতে নেই। যাতে তোমার ওষুধ থাকবে। যা খেয়ে তোমার শরীর ভাল হবে, আগের মতন জোড় পাবে, হাড়ি পুরু হবে আর গায়ের রঙ হবে টক্‌টকে।

তবু বিশ্বাস হয় না নলিনীকিশোরের: আচ্ছা দাদা আমাকেই নিয়ে চল্‌ না একদিন—কতদিন যে বাইরে যাইনি—

—তা কি হবার জো আছে। ডাক্তারবাবু বারণ করে গেছেন। তুমি ত আর অবুঝ নও?

অবুঝ নয় নলিনীকিশোর। তা প্রমাণ করেছে সেই দীপ্ত শীর্ণ চোখ, করুণ দৃষ্টি আর বুদ্ধিদীপ্ত মুখচ্ছবি।

একদিন বাড়ি ফিরতেই কেঁদে ফেললেন মা।

ছানি পড়া চোখে, হাতড়ে হাতড়ে বেরিয়ে এলেন বাবা। চোখে মুখে শিশুর অসহায়তা।

—কি হবে যামিনী—কি উপায় হবে?

—হ্যাঁ, কি উপায় হবে? থেমে থেমে বললেন বাবা।

অবাক হয়ে গেল যামিনীকিশোর। যাবার সময় পর্যন্ত ভালই দেখে গেছে নলিনীকে। তবে কি হল? নলিনী কি তবে ভাল নেই?

—নলিনীকে পাওয়া যাচ্ছে না? বোবা গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন মা।

বাবা বললেন: না নলিনীকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—পাওয়া যাচ্ছে না? চমকে উঠল নিজের মনেই। তবে কি? তক্ষুণি বেরিয়ে গেল যামিনীকিশোর। বেশিদূর যেতে হল না। দেখা হল ট্রাম রাস্তার কাছেই; ফুটপাতে বসে আছে নলিনীকিশোর। রোদে লাল হয়ে উঠেছে মুখখানা। কেমন অদ্ভুত রুক্ষ আর বিদ্রোহীর ভাব। যামিনীকিশোর কাছে যেতেই কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল: দিলে না দাদা— ওরা কিছুতেই ওষুধ দিলে না। কটা টাকাই বা দাম?

যামিনী সান্ত্বনা দিয়ে বলল: ওষুধটা পেলে বেশ হত—আগের মত জোর হত গায়ে, হাড় পুরু হত আর রঙ্ হত টক্‌টকে।

তার পর আর কথা কয়নি নলিনীকিশোর। জিগ্যেস করেনি আর যামিনীকিশোরকে ওষুধের কথা। শুধু বিজ্ঞের মত পারিপার্শ্বিক-তাকে চিনতে চেয়েছে, জানতে চেয়েছে তীক্ষ্ণ আর কঠিন দৃষ্টি দিয়ে। আর একটা কঠোর সঙ্কল্প—শীর্ণ হাতের মুঠি দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করে তুলেছে।

তবু কিসে সঙ্কোচ আর লজ্জা এসে বাধে যামিনীর মনে। একটা উপায়হীন দীনতা সর্বাঙ্গে রাহুর মত চেপে থাকে। তাই নলিনী না শুয়ে পড়লে, তন্দ্রার কুয়াশায় সমস্ত ভুলে না গেলে বাড়ি ফিরতে চায় না যামিনীকিশোর। মনে হয়—কিযে মনে হয়—দাঁতে দাঁত দিয়ে চেপে রাখে। দাঁত বসে যায় নিচেকার ঠোঁটের নরম মাংসের

ওপর। একটা পথ—ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের থেকে একটা পথ খুঁজে পেতে চায়।

তবুও দিন কাটে। রাত ফুরোয়। সময়ের নির্দিষ্ট পরিধি মাপা মাস। ঋতু পালটায়। তবু এই ক্লান্তিকর দুঃসহ জীবনের ছেদ নেই। যতিটানা নেই কোনো খানে। কলেজ স্কোয়ারে গাছের পাতায় বসন্ত আসে বিচিত্র বর্ণের পসরা সাজিয়ে। তারপর আবার কবে কুয়াশার মলিন পর্দায় ঢাকা পড়ে যায় সব। একটা স্মৃতি বিস্মৃতির সাগরে মিশে যায়।

যামিনীর চেষ্টার অন্ত নেই। চিন্তার শেষ নেই। চাকরী যাবার পর ছোট খাট ব্যবসার চেষ্টা করেছিল দু'একবার। ইউনিভারসিটির কাছে টুকিটাকি জিনিস সাজিয়ে বসেছিল। ডিস্‌পোজালের ছোটখাট কমদামী জিনিস। এম, এ, ক্লাসের শেষ বই কটার বিক্রী করা মূলধন। আয় হত কিন্তু সেটা আর মূলধনের সঙ্গে বাঁধা পড়ত না। তাতে আর নতুন করে জিনিসপত্র কেনা হয়ে উঠত না। সংসারের সর্বগ্রাসী চাহিদায় শিশিরের মতই কোথায় মিলিয়ে যেত। বুঝতে পেরেছিল যামিনী-কিশোর। কেমন যেন মনে হত, হবে না—এ করে কিছুই করতে পারবে না। এমন বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রামের কোন মূল্য নেই আজ। একা ঠেকাতে পারবে না সংসারকে। বুড়ো বাবার সত্তর টাকার পেন্‌সনের ওপর সমস্ত সংসারের আক্রোশ আর পুঞ্জিভূত চাহিদাটা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। চাহিদার চাপে দম আটকে আসে। আর নলিনীকিশোর একটা মূর্তিমান শনির মতন সংসারটার কাঁধে চেপে আছে। নড়ন-চড়ন নেই। একটা জগদ্দল পাথরের মতন চেপে ধরেছে শ্বাস। হ্যাঁ, মনে মনে মৃত্যু কামনা করে যামিনীকিশোর নলিনীকিশোরের। হ্যাঁ, মরুক। একটা খরচা কমুক। এ কথা সত্যি যামিনী নিজেও কিছু সাহায্য করতে পারছে না সংসারের। দিতে

পারছে না এমন কিছু। তবুও একটা ভবিষ্যত আছে। ভাগ্যের পাশা পালটালেই একটা কিছু করে উঠতে পারবে। বিদ্যা আছে, আছে কার্যকরী ক্ষমতা আর বুদ্ধি। যা করেই হোক বিশ্বাসী বলদের মত টেনে নিয়ে যাচ্ছে সংসারটাকে। কিন্তু নলিনীকিশোর—অন্ধ ভবিষ্যত কাঁধে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কোনদিন এক পয়সা এনে দেবে না। দিতেও পারবে না। সে কথা যে বোঝে না নলিনীকিশোর তা নয়—যেবার বাবার হাঁপানিটা চাগিয়েছিল ভীষণ রকম—একটা শান্ত পাণ্ডুরতা ছড়িয়ে পড়েছিল ছানি পড়া চোখে। আঘাতের ভীষণতায় অর্ধমূর্ছিত বাবা মা যন্ত্রচালিতের মত পাখার হাওয়া দিচ্ছেন। একটা অদ্ভুৎ ছবি চোখ বুজলেই ভেসে ওঠে যামিনীকিশোরের চোখের পর্দায় বায়োস্কোপের মত।

ডাক্তার ডাকা হয়নি। হবেও না। ফিস্ দেবার মত টাকা নেই। কিন্তু একটা ভীষণ প্রশ্ন। উজ্জ্বল তরোয়ালের মত তীক্ষ্ণ। ডাক্তারের সঙ্গে সহযোগিতা মানে মাসের সত্তর টাকার নির্বুদ্ধিতা।

সন্ধ্যার অন্ধকারে মুটের মাথায় চাপিয়ে নিয়ে গেছল বড় ষ্টিল ট্রাঙ্কটা মা বাবার বিয়ের সময়কার—একটা পুরনোদিনের স্মৃতি। একটা গীতিকাব্য। পাঠোদ্ধারের উপায় নেই। পোকায় কেটে ঝরঝরে করে ফেলেছে।

বেশ মনে পড়ে উপায়টা বাতলে দিয়েছিল নলিনীকিশোর। সকলেই একটা ভীষণ দুর্ঘটনার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে চেষ্টা করছিল। আস্তে ভীষণ আস্তে পায়ের শব্দ না করে এসে দাঁড়িয়েছিল বাবার ঘরের দরজার সামনে। ঘরের ভেতর হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলো। হঠাৎ দেয়ালে ছায়া পড়ল। একটা ভুতুরে ছায়া। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে।

সবাই চমকে তাকাল: কে?

—আমি। আস্তে তার স্বভাবসিদ্ধ গলায় ফিস্ ফিস্ করে বলল নলিনীকিশোর।

—কি চাই তোমার এখানে? যাও ওঘরে। কঠিন আর কর্কশ শোনাল যামিনীর গলা।

—আজ আর আমল দিল না নলিনীকিশোর। উড়িয়ে দিয়ে বলল: ডাক্তার এসেছে? কেন আননি?

এবার মা সম্বিৎ খুঁজে পেলেন: টাকা কোথায়—টাকা? ওরা ত আর তোমার চাঁদ মুখ—

—চুপ্। মাকে থামিয়ে দিল নলিনীকিশোর: শোন ব্যবস্থা করেছি আমি। এস আমার সঙ্গে। নিজেই টেনে নিয়ে এল ট্রাঙ্কটা। ভারী ষ্টিলের। ভেতরে ছিল পুরনো দিনের ছেঁড়া কাগজপত্র, কাঁথা আরো আজে বাজে টুকিটাকি জিনিস।

নলিনী আবার বলল: এটাই—এতেই হবে। বিক্রী করে দাওগে কারো কাছে। ডাক্তার আনার টাকা হয়ে যাবে। তারপর প্রায় বিড় বিড় করে বলল: আমার জন্য রেখেছিলাম! ওষুধটা কিনব বলে। সেই যে যাতে আবার আমি আগের মত জোর পেতাম গায়ে, হাড় পুরু হত আর গায়ের রঙ হত টকটকে—কিন্তু বাবা না বাঁচলে পেন্সনের টাকা কাটা যাবে। আর দেবে না। সকালে বিকেলে দুমুঠো ভাত জুটবে না আর—

অবুঝ নয় নলিনীকিশোর। তীক্ষ্ণদৃষ্টি তার চারদিকে। তার বেঁচে থাকার দাম আজ সংসারে কতটা? তার জানতে আর বাকী নেই। সে জানে একটা অথর্ব মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়।

বেশ মনে পড়ে নলিনীকিশোর উপায়টা পর্যন্ত বাতলে দিয়েছিল: মুটের মাথায় করে নিয়ে যাও দাদা। কেউ বুঝতে পারবে না—আর যদি কেউ জিগ্যেস করে বলবে রঙ করতে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ওষুধটা? একটা দীর্ঘনিশ্বাস আস্তে ছাড়লেও কানে এসেছিল যামিনীকিশোরের। ইচ্ছে করেছিল একটা ভীষণ চড় কসায় হতভাগাটার গালে। কিন্তু নিজেও একবার আওরাল যামিনী মনে মনে: বেশ হত। ওষুধটা পেলে হত—

তারপর ডাক্তার এসেছিল। ওষুধও দিয়েছিল। বাবা ভাল হয়ে উঠলেন আস্তে আস্তে। একটা অস্বস্তির ভাব আস্তে আস্তে নেমে গেল সংসারের ঘাড় থেকে।

পথ চলে চলে জুতোর আয়ু কমে। হাপসোল ক্ষয়ে যায়। হাঁপ ধরে বুকে। ক্লান্তি জ্বরের মত আচ্ছন্ন করে রাখে সমস্ত শরীরকে। তারপর আবার চলা—কিন্তু সংসার আর চলে না।

মাঝে মাঝে ভাবে বেশ হত চাকরীটা থাকলে। অন্ততঃ আফিমখোরের মত সংসারটা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলতে পারত। সেই যে ফেলে আসা চাকরী নিয়ে মন স্বপ্নিল হয়ে ওঠে। কোন একটা দিশী ওষুধের কারখানার যামিনীকিশোর পেষ্টিং ডিপার্টমেণ্টে কাজ করত। নানারকম ওষুধের ওপর নানা রকম লেবেল মারতে হত তাকে। ভীষণ সাবধানতার সঙ্গে কাজ করতে হয় তাদের। যামিনীকিশোর ছাড়া আরো দশ এগারো জন কাজ করে তারা! মধ্যবিত্ত ঘরের শ্রমজীবী ছেলে কতগুলো—

প্রথমদিন অবশ্য লজ্জায় মাথা কাটা গেল যামিনীর। কেমন একটা অসহায়তা ফুটে উঠেছিল চোখে মুখে। এম-এতে ইংরেজী নিয়ে পড়েছিল। দখল ছিল ইংরেজী সাহিত্যে। ভাবলে কান্নার সঙ্গে হাসি পায়। ইণ্টারভিউর সময় একজন জিগ্যেস করেছিল তাকে: ইংরেজী পড়তে পার ত হে?

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল যামিনীকিশোর। একটা শক্ত উত্তর দিতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারপরে সেই সত্তর টাকার ওপর তিরিশ দিনের জীবন যাপনের অক্লান্ত মহড়া। তখন শুধু মাথাই নেড়েছিল যামিনীকিশোর।

আবার প্রশ্ন: শুধু মাথাইত নাড়ছ। এবার তাতে ভুলছি না। সে ব্যাটাও ত মাথা নেড়েছিল, তারপর গ্লুকোজের ওপর ভিটামিন ডির

লেবেল মেরে বসেছিল। আজপর্যন্ত চিঠি আসছে তার জন্য। টেবিলের ওপর থেকে একটা ইংরেজী মাসিকের পাতা খুলে পড়তে দিয়েছিল : একটা লাইন পড়ত হে—

দাঁত দিয়ে চেপে রেখেছিল নিচেকার ঠোঁট। হয়ত একটু জোরেই বসে গেছল নরম মাংসের ওপর। কিন্তু চোখের সামনে অথর্ব বাবা—শান্ত নির্বিরোধী মা আর নলিনীকিশোর রুগ্ন আর পংগু। কাঁপা হাতে বইটা তুলে নিয়ে উচ্চারণ করে দুটো লাইন পড়ে হাঁপাতে লাগলো যামিনীকিশোর।

—হাঁ, হবে, হবে। পারবে তুমি। যদিও উচ্চারণে ভুল তা হোক—

চাকরী পেয়ে গেল যামিনীকিশোর। মাস গেলে নব্বুই টাকা মাইনে।

এবার—এবার কিনে দেবে নলিনীকিশোরকে ওষুধটা। সত্যি কিনে দেবে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল যামিনীকিশোর। আর লুকিয়ে লুকিয়ে ফিরতে হবে না তাকে—ফিরতে হবে না নলিনীকিশোর ঘুমিয়ে পড়ল পরে। হাসি ফুটবে সকলের মুখে বাবা মার—

ছানি পড়া চোখে দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে এসে জিগ্যেস পর্যন্ত করে গেছেন বাবা একদিন।

রাতে শুয়েছিল যামিনীকিশোর। বাইরে আওয়াজ, পায়ের শব্দ।

—কে? উঠে দাঁড়াল যামিনীকিশোর। বাইরে এল। হাতে হ্যারিকেনের অনুজ্জ্বল আলো। মুখ খুলল যামিনীকিশোর : কে? বাবা আপনি?

বোকা বোকা চোখে হ্যারিকেনের আলো এসে পড়েছে। কেমন সাদা ড্যাবড্যাবে দেখাচ্ছে : আমি, হ্যাঁ, তোর নাকি চাকরী হয়েছে নব্বুই টাকা মাইনেতে। নব্বুই টাকা। ভাল বেশ ভাল। বিড় বিড় করে বলেন : আমরা ঢুকেছিলাম সেই কবে ৩৫৲ টাকা মাইনেতে। হাত তুলে আশীর্বাদ করেন বাবা। তারপর বলেন : শোন—

কাছে শোন বলে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসেন বাবা। কানে কানে বলেন: আমাকে একদিন সন্দেশ খাওয়াবি? কতদিন খাইনি—জিভের জল টানেন বাবা: কতদিন খাইনি। কাউকে জানাবি না—কাউকে না, শুধু তুই আর আমি—একটা বঞ্চিত আত্মা যেন হাহাকার করে উঠল। কেন সেদিনও তোমাকে লুকিয়ে দিয়েছিলাম—আবার তুমি আমাকে কি পেয়েছ। লুকিয়ে সেদিন একটা ভাল জামা কিনে দিলাম। সকলকে লুকিয়ে দিলাম জুতো। বেড়াতে যাবার নাম করে নিয়ে গেলাম ডাক্তারের কাছে চোখের ওষুধের জন্যে। কতগুলো টাকা খরচ করলাম—

হ্যারিকেনটা পড়ে থাকে মাটিতে। অনেকক্ষণ কেমন মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন বাবা। তারপর আস্তে আস্তে দেয়াল ধরে ধরে ফিরে গেলেন নিজের ঘরে।

দাঁড়িয়ে রইল—অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল যামিনীকিশোর। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

তারপর সমস্ত বছরের সাড়ে সাতলক্ষ টাকা লাভ করেছে কোম্পানী। কাজ বেড়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশি। নিশ্বাস ফেলার ফুরসৎ নেই কারুর—কিন্তু আড়াই বছরে আড়াই টাকাও মাইনে বাড়েনি কারুর—

বড় সাহেবের মেয়ে বিলেতে গেছে এক বিলেতী বন্ধুর নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। ছোট ছেলে এ্যাক্সিডেণ্টে একটা গাড়ী ভাঙ্গার পর আরো একটা গাড়ী কিনেছে। ছোট সাহেব বাড়ির ডিনার ছেড়ে গ্র্যাণ্ডে ডিনার খাচ্ছে আজকাল—

ভাবে—কিযে ভাবে বুঝতে পারে না যামিনীকিশোর। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে রাখে—দাঁত বসে যায় ঠোঁটের নরম মাংসের ওপর—

আর নলিনীকিশোর—এখন শয্যাগত। উঠতে পারে না। শক্তি

নেই। সামান্যতম শক্তি থাকতে সে চলা ফেরার স্বপ্ন দেখত! এখন শুয়ে থাকে। বাইরে অফুরন্ত আকাশ, বাতাস আর জীবন! মধ্যবিত্তের নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে একটা প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সমাজ। লোভীর মত তাকিয়ে আছে নলিনীকিশোরের দল। শীর্ণ দৃষ্টিতে একটা প্রশ্ন। উজ্জ্বল তরোয়ালের মত ক্ষুরধার। কেন এমন হয়? নলিনীকিশোর খোঁজে—চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার শত্রুদের যারা বাঁচতে দিচ্ছে না তাকে। বাতাস, আকাশকে অন্ধকার আর বিষাক্ত করে তুলছে যারা। সমাজের নিষ্করুণ রথচক্রে বলি হচ্ছে তার মত কতশত নলিনী-কিশোর—যারা পথ খুঁজে পাচ্ছে না—

কিন্তু যামিনীকিশোর? সে খুঁজে পেয়েছে, চিনতে পেরেছে শত্রুদের। তাদের সঙ্গে একটা মুখোমুখি লড়াই এর জন্য এবার প্রস্তুত। ছদ্মবেশের আড়ালে খুঁজে পেয়েছে তাদের—শয়তানদের। খুজে পেয়েছে পথ। পাহাড় পাষাণ নির্দিষ্ট গণ্ডিটানা জীবন—উপায়হীন দৈন্য লজ্জা। অথর্ব বাবা মা আর রুগ্ন নলিনীকিশোর—আর তাদের ঘিরে পঙ্গু সমাজ আর ঘুণেধরা জীবনযাত্রা।

ধর্মঘটের অজুহাতে মালিক গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। তবু যামিনী জানে এছাড়া আর পথ নেই—আর অন্য কোন পথে আসবে না সেই ওষুধ যে ওষুধে নলিনীকিশোরের গায়ে জোর আসত, পুরু হত হাড় আর গায়ের রঙ হত টকটকে।

কোথায় যেন ঘড়িতে একটা বাজল। ঘড়ির কাঁটাটা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ডায়েলের ওপর—আর একদিনের আয়ুকে কুড়ে কুড়ে যাচ্ছে।

প্রতিরোধ

বিছানায় শুয়ে শুয়ে গোটাদুয়েক বিড়ি খায় শুকদেব।

একটু আগেই ঘুম ভেঙে গেছে। অন্য সবদিনের চেয়ে অনেক আগেই জেগেছে আজ। শুয়ে শুয়ে শুনছে শুকদেব বাড়ীর টুকটাক টুকরো টুকরো কথা। বেশ চাপা উত্তেজনার সংগে আস্তে আস্তে আলোচনা, কথাবার্তা কইছে সবাই। পাশ ফিরে শুয়ে ভাবতে থাকে শুকদেব একটুকরো কাগজ কয়েকঘণ্টার মধ্যে একটা সংসারে কত পরিবর্তন আনতে পারে। আশ্চর্য! ভাবতেও ভারী আশ্চর্য লাগে শুকদেবের।

এখনও ভাল করে রোদ ওঠেনি। ঘন কুয়াশার খানিকটা দেখা যাচ্ছে জানালা দিয়ে। ভারী ঘন আর পুরু, নজর চলে না ভাল করে। কোথাও এতটুকু আকাশের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। শুধু দূরে তিনতলা বাড়ীটার মাথায় একটু লাল আভা। হয়ত রোদ উঠেছে।

ছোট বারান্দাটায় থালাবাসন নাড়াচাড়ার শব্দ পাওয়া যায়। বেতো শরীর নিয়ে মা হয়ত নিজেই এসেছেন এত ভোরে রান্না চড়াতে। ভাইবোন কেউ কেউ এই শীতের মধ্যেও উঠে এসেছে। হাতের কাছে ফাইফরমাস খাটছে টুকটাক।

টেবিলের উপর পুরনো টাইমপিসটায় ছ'টা বেজে ক'মিনিট যেন। চোখবুজে আবার পাশ ফিরে শুল শুকদেব। খড়মের আওয়াজ পাওয়া গেল বাইরে। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে এসে হাজির হয়েছেন বাবা নিজেই। মার ওপর ভার দিয়ে সুস্থির থাকতে পারেননি বিছানায়।

—তুমি আবার এত ভোরে উঠতে গেলে কেন বলত? মার গলা পাওয়া গেল কেমন উদ্বিগ্নের মত: আবার ঠাণ্ডা লাগাবে ত? যাও যাও ঘরে যাও।

—না না ঠাণ্ডা লাগবে কেন, ভাল করে গায়ে কাপড় দিয়েছি ত। হ্যাঁগা, তুমি নিজে বাসন মাজতে বসেছ কেন? ঝিটা আসেনি বুঝি? একটু ধমকে দিতে পার না। কামাই করবি তো কর আজকেই? আশ্চর্য! না না আসলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে। ভাত চাপিয়েছ? দশটার সময় যেতে বলেছে। অন্ততঃপক্ষে আধঘণ্টা আগে যেতে হবে ত। নটার মধ্যে বাড়ী থেকে বেরুতে হবে ওকে। সাড়ে আটটার মধ্যেই ভাত চাই।

মার কোন উত্তর পাওয়া যায় না। বাসনমাজার ঠন্ ঠন্ আওয়াজটা শুধু আরো জোরে, আরো তাড়াতাড়ি হতে থাকে। বাবা আরো কিছু হয়ত বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে মার গলা পাওয়া গেল: আঃ, তুমি যাও ত এখান থেকে। সময়মত সবই হবে।

আবার খড়মের আওয়াজ হল। বাবা হয়ত উঠে গেলেন।

উনুনে আঁচ পড়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। পাতলা ধোঁয়ার কেমন একটা কটু গন্ধ। বুকের ভিতরটা জ্বালা ধরিয়ে দেয়। শুকদেবের অবশ্য বিশেষ কষ্ট হয় নি। দাদার কষ্ট হবে ভেবে ভায়েরা এসে বাইরের দিকের জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে গেল।

একটু আগেই মাকে লুকিয়ে বাবা চুপিচুপি ভাইবোনদের বলেন:

যা না বাসনগুলো মেজে দে হাতে হাতে তোরা। মার শরীর খারাপ, অসুখে ভুগছে দেখছিস না। শীতের মধ্যে চট্ করে কেউ জলে হাত দিতে চায় না। গোঁজ হয়ে এ ওর মুখ চাওয়াচায়ি করে, ভাবে কে আগে যায়। বাবা ফিস্ ফিস করে বলেন: আজ দাদা চাকরী করতে যাচ্ছে জানিস? কত টাকা আনবে; কত জিনিস আনবে তোদের জন্যে। জামা, কাপড় হুঁ হুঁ—যে যাবে সেই আগে পাবে—

শীতে কাঁপতে কাঁপতে, কুঁকড়ে গুড়িসুড়ি মেরে দাঁড়ায়। ছেঁড়া সুতির জামায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে দাঁতে দাঁত লেগে। দাদা চাকরী পাবে। টাকা আনবে। মনে মনে ভাবে, জানতাম দাদা একটা কিছু করবে। অত মোটা মোটা বই পড়ে, যা তা নয়। সবচেয়ে ছোট ভাইটা আস্তে আস্তে বাবার কোল ঘেঁষে দাঁড়ায়। বলে: দাদা অনেক টাকা আনবে, না বাবা?

বাবা কিছু বলার আগে সবাই বলে: এ মা তাও জানিস না—দাদা অত বই পড়ে তাও দেখিসনি—?

ছোট ভাইটা মাথা নাড়ে। আস্তে আস্তে বলে: আমাকে বেশী করে খেতে দিও কিন্তু—বলে থামে।

সবাই অবাক চোখে তাকায় তার দিকে। প্রতীক্ষা করে রুদ্ধশ্বাসে কিছু আবোলতাবোল বকবে হয়ত।

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটা আবার বলে: আমার যেন মণ্টুদের বাড়ীর ছোট্টুর মত চেহারা হয়।

দু'চারদিন আগে বাড়ীওয়ালা তাগাদা দিয়ে গেছে। দুমাসের ভাড়া বাকী পড়েছে। তাই ভাষাও হয়েছিল জোরালো: টাকাটা না দিতে পারেন সোজা বাড়ী ছেড়ে দিন—আজকাল আর ভাড়াটের অভাব নেই।

হাতজোড় করে বলেছিলেন বাবা : বড্ড টানাটানি যাচ্ছে স্যার, দুবেলা দুমুঠো খেতেই সব চলে যাচ্ছে।

—খোলার বস্তি আছে সেখানে চলে যান, কম ভাড়ায় পাবেন।

ছোট ছেলেটাও ছিল সেখানে। অবাক হয়ে চেয়েছিল। দেখছিল বাবার অসহায় চেহারা। তার ছোট বুকটাকেও অসহ্য ক্রোধে তোলপাড় করে তুলেছিল। ক্ষোভে-দুঃখে কেঁদে ফেলে সে। তার চেতনায় প্রতিফলিত হয়ে ওঠে এই সমস্যা। সে সমাধান খুঁজে পায় ছোট্টুর মধ্যে। যা দিয়ে অন্যায়কে প্রতিরোধ করা যায়।

তারপর আর কারো দিকে না তাকিয়ে, শীতে কাঁপতে কাঁপতে চলে যায় মার কাছে। থালাবাসনে জল দেয়। ঠাণ্ডায় নীল হয়ে যায় ঠোঁট তবুও দাঁতে দাঁত দিয়ে চেপে রাখে।

আর সব বড়রা কেমন যেন বোবা হয়ে যায়। জামা, কাপড়, গল্পের বই, কত কি চাইবে ভেবেছিল দাদার কাছে কিন্তু মনে হল ক্ষুদে ভাইটা সবাইকে টোপকে গেছে। লজ্জায় কেমন মিইয়ে যায় সবাই। তারপর আর কথা কয় না কেউ। সবাই একসঙ্গে যায় মার কাছে, থালাবাসন নিয়ে কাড়াকড়ি করে মাজতে শুরু করে দেয়।

বাবা আসেন রান্নাঘরে উনুনে আঁচ উঠল কিনা দেখতে। হাওয়া দিতে দিতে বলেন : অনু, চায়ের জল বসা।

মা তাড়া দেন বাইরে থেকে : এবার উঠে পড় দেবু। অনেক বেলা হল, মুখ ধুয়ে আয়।

অনু এসে বলে : চা খাবে না দাদা? মুখ ধুয়ে এসো।

মুখ ধুয়ে এসে সবাই গোল হয়ে বসে চা খায় আর গল্প করে।

বাবা তাড়া দিয়ে বলেন : গল্প আর পালিয়ে যাচ্ছে না তোমাদের। কিন্তু আজ ও যেন ঠিক সময়ে ভাত পায়।

মা ঝংকার দিয়ে ওঠেন : কাজের সময় বিরক্ত করো না—অনেক

দেরী আছে এখনও। বাজারে যাচ্ছ বাজারে যাও। তারপর উঠে গিয়ে আবার বলেন : মাছ আজ একটু ভাল দেখে এনো।

ছোট ছোট ভাইবোনেরা দাদাকে ঘিরে থাকে নির্ভয়ে। দাদা যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ পেয়ে গেছে—ইচ্ছে করলেই অনেক টাকা, আরো অনেক জিনিষ অতি সহজেই এনে দিতে পারবে।

এক ফাঁকে অনু জিগ্যেস করে : কত টাকার চাকরী দাদা? দেড়শ', দুশ' হবে নিশ্চয়, কি বল?

শুকদেব বলে : না না, অত হবে না! কেরানীর মাইনে ত, কত আর হবে টেনে টুনে বড জোর শ'খানেক যদি দেয় ত ভাগ্য ভাল বলতে হবে।

অনু বেশ জোর দিয়ে বলে : আমি বলছি একশ' টাকার কম নয়। একশ' টাকার কমে কখনও সংসার চলে আজকালকার দিনে? যা মাগ্‌গিগণ্ডার বাজার, ওরা বোঝে না ভেবেছ—ওদের ত সংসার আছে। প্রথম মাসের মাইনে পেলে আমাকে কিন্তু খাওয়াতে হবে বলে দিচ্ছি। আমি সবচেয়ে প্রথম তোমার চিঠিটা পেয়েছি হুঁ—

শুকদেব বলে : আগে চাকরী হোক তারপরে ত! এক মাসের পর মাইনে—আমার ত চাকরীর আশা নেই—

—কি সব অলুক্ষণে কথা তোমার দাদা, দাঁড়াও বলছি মাকে—একটু থেমে আবার বলে অনু : আচ্ছা দাদা বড় চাকরী যদি হয় তবে আমি আবার পড়ব কিন্তু। ম্যাট্রিকটা পাশ করলে এখন একটা চাকরী করা যেত।

হঠাৎ অবাক হয়ে শুকদেব তাকায় অনুর মুখের দিকে। অনুর মত লাজুক মেয়ে আজ চাকরীর কথা ভাবছে। চার বছর আগে স্কুলে পড়ার সময় হেঁটে যেতে পারত না রাস্তা দিয়ে লজ্জায়। দুদিন না

খেয়ে থেকে বাবার কাছ থেকে বাসের ভাড়া আদায় করে নিয়েছিল যে অনু তার আজ চাকরীর কথা বলতে একটুও লজ্জা করল না— একটুও কাঁপল না গলার স্বর।

অবাক হয়ে শুকদেবকে থাকতে দেখে অনু আবার বলল: কেন আজকালত ভদ্রঘরের অনেক মেয়ে চাকরী করছে দাদা, চেনাশোনা অনেককেইত দেখি—

আরো অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিল তাকে থামিয়ে দিয়ে শুকদেব বলল: সে অনেক দেরী আছে, আগে চাকরী হোক—তুই পাশ করবি, সে অনেক দেরী আছে—

বাবা এক সময় বাজার থেকে ফেরেন।

বেলা আরও বাড়ে ক্রমে ক্রমে।

চায়ের মজলিস ভেঙে উঠে পড়ে শুকদেব। হকার ততক্ষণে কাগজ দিয়ে গেছে। তারই ওপর একটু চোখ বুলিয়ে নেয় চট করে। রোজকার অভ্যাসমত কর্মখালির কলমটা একবার দেখে। তারপর হঠাৎ কথাটা মনে পড়ায় ছোট ভাইটাকে দিয়ে কাগজটা বাবার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ছেলে পড়াতে বেরোয় শুকদেব।

পড়াতে পড়াতে শুকদেব বলে: আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে যাব খোকন। চট করে পড়ে নাও—

—কেন মাস্টারমশাই?

—একটা জরুরী কাজ আছে। আচ্ছা খোকন, তোমার বাবা বাড়ী আছেন? ডেকে দাওনা একবার—

—বাবা ত বাড়ী নেই। কেন বলুন ত?

—দরকার ছিল। একটু থেমে আবার বলে শুকদেব: তোমার মাকে গিয়ে বল ত মাস্টারমশাই এ মাসের টাকা থেকে পাঁচ টাকা আগাম

চাইছেন। যাও চট করে একবার ঘুরে এসো দেখি—টাকাটা আনা চাই কিন্তু।

খোকন চলে যায়।

বসে বসে অঙ্ক মেলায় শুকদেব। খোকন কিন্তু অনেক দেরী করে ফেরে। ওর মুখ দেখেই বোঝে শুকদেব—পারেনি আনতে। মুখখানা কাঁচুমাচু করে চুপচাপ আবার পড়তে বসে খোকন। একটু উস্‌খুস করে জিগ্যেস করে শুকদেব: কি হল? মা কি বললেন? হঠাৎ কিছু জবাব দিতে পারে না খোকন। মা বললেন—বলে ঢোঁক গেলে খোকন—

শুকদেব অভয় দেয়: ভয় কি—তুমি বল না—

মা বললেন, ভোরবেলায় কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে টাকা চাইতে নেই তোর মাস্টার জানে না? শুকদেবের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ থেমে গেল খোকন।

কেমন কঠিন হয়ে আসছে শুকদেবের মুখটা। অসহ্য রাগে অপমানে কেমন লাল আর চোখের দৃষ্টিতে উন্মাদ চাউনি। নিজেকে সামলে নিয়ে শুকদেব বলল: থামলে কেন বল—আর কি বললেন—?

খোকন আমতা আমতা করতে লাগল:—মা ত আর—

ধমক দিয়ে বলল শুকদেব: বল আর কি বলেছেন?

—যা বলগে টাকা এখন হবে না। সবে ত মাসের সাতদিন হয়েছে—বলে থেমে যায় ছেলেটা। চামার কথাটা কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারে না।

অসহ্য ক্রোধে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল শুকদেব। তারপর বইখানা মুড়ে রেখে দিল টেবিলের ওপর। বলল: আজকে আর পড়াতে পারব না। যদি কোনদিন আবার আসি সেদিন—আচ্ছা তোমার মাকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলো মাস্টারমশাই বললেন,

টাকার জন্যে যারা গোলাম হয়ে থাকে তাদের তিনি ভীষণ ঘৃণা করেন। কাপড়ের খুঁট দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলো শুকদেব। সকালের রোদে তাকে যেন কেমন রুক্ষ আর উদ্ধত বলে মনে হতে লাগল।

কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বাড়ী ফিরতে মাথাটা অনেক ঠাণ্ডা হয়ে এল শুকদেবের। বাড়ী ফিরতেই সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল। মা রান্না ফেলে ছুটে এলেন: ফিরতে এত দেরী হল কেন? আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরবি ত—

চান করে, কাপড় ছেড়ে জামা পরতে গিয়ে দেখে পিঠের কাছটা অনেকখানি ছেঁড়া—

অনু তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বলল: এ মা, জামাটা যে ছেঁড়া অনেকখানি—দাও দাও টেঁকে দি চট্ করে।

চটে উঠল শুকদেব: এতক্ষণ কচ্ছিলে কি? জান না আমি বেরুব এখন। একটু দেখে রাখিতে পারনি? একটা কাজ যদি হয় তোমাদের দিয়ে—। রেগে গেলে তুমি বলতে শুরু করে শুকদেব।

অনু কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে: বারে আমি জানব কি করে যে তোমার জামা ছিঁড়ে গেছে। দাও না কতক্ষণ লাগবে আর—

খেতে খেতে জামাটা সেলাই হয়ে গেল। ভায়েরা জুতোজোড়া ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে রেখেছিল। বেরুবার সময় মা বললেন: ঠাকুর নমস্কার করে বেরুবি।

ওদিকে বাবা খালি তাড়া দিচ্ছেন ঘন ঘন: অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে দেবুর, ওকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও।

মা চুপি চুপি আট আনা পয়সা গুণে দিয়ে গেলেন ছেলের হাতে। সারাটা দুপুর জল্পনা কল্পনায় কেটে গেল সকলের। ছোট ছোট ভাইবোনেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে: বুঝলি ছোড়দা,

মঞ্জুলদের মত একটা গাড়ী কিনতে হবে আমাদের। রোজ বিকেল-বেলা কেমন গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়া যাবে।

আর একজন বলে: দূর বোকা! দাদাকে বলব ওদের মত একখানা বাড়ী কিনতে, কেমন মজা করে থাকা যাবে।

ছোট ভাইটা চুপচাপ করে শুনছিল সেও এক সময় বলে উঠল: আমি বন্দুক কিনব। তারপর যে বাবাকে এসে বকবে তাকে গুলি করে মারব।

অনুর চোখে ঘুম নেই। পাশের বাড়ীর বন্ধুটি কলেজ থেকে ফেরেনি এখনো। তার কাছ থেকে স্কুলের বইগুলো চেয়ে নিতে হবে। সত্যি অন্ততঃ ম্যাট্রিকটা পাশ করতেই হবে। যেমন করেই হোক। বাবার যা শরীর সবাই মিলে বসে বসে খেলে আর চলবে না। অনু ত বোঝে সংসার চলছে কি করে, জোড়াতালি দিয়ে চালাচ্ছেন বাবা। ভারী আশ্চর্য লাগে অনুর—এত ঝক্কি কেন নিতে যান বাবা। দাদা বড় হয়েছে—দাদাকে বলে দিলেই ত পারেন,—তোমার পথ তুমি দেখ। কি দরকার অত খেটে বুড়োবয়সে? ম্যাট্রিকটা পাশ করলে অনু নিজেই নিজের পথ দেখে নেবে। কারো বোঝা হয়ে থাকবে না। এর মধ্যে যদি বিয়ের কথা ওঠে—বিয়ে হয়ে যায়ত ভালই, বাবাকে রেহাই দেওয়া যাবে। মনে মনে তেমন আশা পায় না, এত টাকা পাবেন কোথায় বাবা? উনিশ বছরের ইতিহাসের জাবর কাটে অনু বিকেলের পড়ন্ত রোদে পিঠ দিয়ে।

বিকেলবেলা তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। মা তাড়া দেন: উনিশ বছরের ধুমসো মেয়ে, বিয়ে দিলে দুছেলের মা হতিস, একটু বুদ্ধি হল না দাদার জন্য জলখাবার করে রাখি।

অনু বলে: বারে তুমি বলেছিলে আমাকে? আমি কি করে জানব?

—তা জানবে কেন—নভেল-নাটক পড়তে ত বেশ জান। আচ্ছা এসব কথা কাউকে বলে দিতে হয়! বাছা আমার আসবে সারাদিনের কাজকর্মের পর শুকনোমুখে। মুখের কাছে কি তুলে দেব বল দিকিন?

মার রকম দেখে হাসি চাপতে পারে না অমু।

মা আবার বলেন: হাসিসনে। দেখলে সর্বশরীর জলে যায়। মরণ হয়েছে আমার।

তবুও একটু রাত করেই ফেরে শুকদেব।

এর আগে বাবা দুবার খোঁজ নিয়ে গেছেন। সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করছিল। সেই কোন সকালবেলা দুটো নাকেমুখে গুঁজে বেরিয়েছে। ক্রমশঃ সকলেই একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। সবাই কিছু একটা অমঙ্গলের কথা চিন্তা করছিল গোপনে গোপনে। এমন সময় নায়কের মতই উদ্ধত ভঙ্গি নিয়ে এল শুকদেব। এক সঙ্গে সবাই জিগ্যেস করল: কি, এত দেরী হল যে?

ছোট ভাইবোনেরা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল—মা সবাইকে ধমক দিয়ে বললেন: চুপ কর সব কেউ বিরক্ত করিস না দাদাকে—সারাদিন কিছু খায়নি। আগে খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নিক। পরে নিজেই কৌতূহল চাপতে না পেরে বললেন: এত দেরী হল কেন? আমি ত ভাবছিলাম—

কি ভাবছিলেন তা আর বলা হল না। বাবা তাড়া দিয়ে বললেন: থাক্, গল্প পরে হবে। আগে ও একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিক—

খেতে খেতে একটু যেন অন্যমনস্ক মনে হল শুকদেবকে। চারপাশে সবাই উস্‌খুস্ করছে। একটা কিছু শোনার জন্ম উদগ্রীব হয়ে আছে। মুখের ভাতটা ভাল করে চিবিয়ে খেল শুকদেব। মুখ তুলে দেখল সবাই একটা কিছুর জন্ম অপেক্ষা করছে। একটু বসে নিয়ে বলল

শুকদেব: আমার ফিরতে দেরী হয়ে গেল। যা অবস্থা—সকলের মুখের উপর দিয়ে আর একবার চোখদুটো ঘুরিয়ে নিল শুকদেব। আবার বলল: অপিসে যা ব্যাপার—উঃ, আড়াই হাজার লোক কেউ কাজ করছে না—একজনও না। সত্যি কেন করবে বলত? চাকরী করে যদি পেটই না ভরল—ছেলেমেয়েগুলো যদি না খেয়েই থাকবে—পয়সার জন্য মানুষ হবে না তবে অমন চাকরী করে লাভ?

মা বললেন: নে নে ভাত মুখে দে—

একদলা ভাত মুখে দিল শুকদেব। কিন্তু চিবিয়ে খাবার তর আর সইল না। তাড়াতাড়ি গিলে আবার বলল: সাহেব আদর করলে খুব, তবে আমরা ত আর কচি খোকা নই, পিঠ চাপড়ালেই ভুলে যাব! আড়াই হাজার লোকের সুখদুঃখ, হাসিকান্নার ব্যাপার মা—সবাই ত আমাদের মতন গেরস্থঘরের ছেলে। লেখাপড়া শিখেছে, সাধ আহ্লাদ আছে। আগেত জনি না অতশত, পরে শুনলাম আর কি। আড়াই হাজার লোকের মা-বোনদের সুখদুঃখ যাতা ব্যাপার নয়—বলে সকলের মুখের দিকে তাকাল শুকদেব।

মা বললেন: নে নে ভাত খা। গল্প কি ফুরিয়ে যাচ্ছে? রাত ত কম হল না—বুড়ো শরীরে আর কত কুলোবে? তুই বেশ করেছিস—অত ভোরে উঠে রোজ ভাত দেওয়া সোজা কর্ম নয়—

বাবা বললেন: তোমার বাতের শরীর, কোন দিন অসুখটা বাড়িয়ে বস তার ঠিক নেই—

অনু বলে: মা, দাদাকে আরো ভাত দাও।

মাথা নিচু করে ডাল দিয়ে আরো ভাত মেখে নেয় শুকদেব।

পতাকা

—পতাকা নেবেন স্যার পতাকা ? বললে ছেলেটা।

পুলিশ মোড়ের কাছটায় হাত দেখাতেই গাড়ীটা দাঁড়িয়ে রাশি রাশি ধোঁয়া ছেড়ে গর্জাচ্ছিল।

আশে পাশে হয়ত কোথাও ছিল ছেলেটা—গাড়ীর কাছে এগিয়ে মুখটা বাড়িয়ে একগাল হেসে জিগ্যেস করল : পতাকা নেবেন না ?

ভ্রূ কুঁচকে একটু কায়দা করে তাকালেন ভদ্রলোক। যেন জিগ্যেস করতে চাইলেন : তোমার কাছ থেকে কোন পতাকা নেব বলে অর্ডার দিয়েছি তেমন ত আমার মনে পড়ে না। তারপর আবার তেমনি নির্বিকার হয়ে হাতের ছ'পেনি ইংরাজি নভেলখানা চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

—স্যার পতাকা একটা ?—বললে আবার ছেলেটা।

আবার চোখ তুললেন ভদ্রলোক : হঠাৎ পতাকা কিনতে হবে যে ব্যাপারখানা কি শুনি ?

হঠাৎ যেন একটু হেসে ফেলল ছেলেটা : কালকে পনরই আগষ্ট পতাকা লাগবে না ? বলে কাঁধের ওপর থেকে একটা বড় দেখে পতাকা সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয় : আমরা তৈরী করেছি স্যার—

নিজেরাই সুতো কেটে, তাঁত বুনে রঙে ছুপিয়ে তারপর তিন রাত ধরে সেলাই—

ভদ্রলোক বাঁ হাত বাড়িয়ে একবার ছুঁয়ে দেখলেন সন্তর্পণে : ধ্যাৎ। তারপর আবার বললেন : চট্‌কল থেকে চট্‌ আনলেই ত আরো ভাল হত। শুধু শুধু খেটে মরেছিস—এ পতাকা তুললে ত বাড়ীই ধ্বসে পড়বেরে—হাসলেন ভদ্রলোক মোলায়েম করে: না না এ—কথাটা শেষ করতে হল না, সোফার ততক্ষণে গাড়ীটা ছেড়ে দিয়েছে। একবার কৌতূহলে তাকিয়ে দেখলেন পেছনের দিকে—ছেলেটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে তেমনি।

ছেলেটা হয়ত আরো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফেরি করবে। পতাকা নিজেরাই সুতো কেটে, কাপড় বুনে, রঙে ছুপিয়ে সেলাই করেছে তিনরাত জেগে।

ঘুরতে ঘুরতে পা টন্‌ টন্‌ করছে ছেলেটার। ফেরি করতে আর ইচ্ছে করছে না। কিন্তু—অন্ধ দাদা, বৃদ্ধা মা তারা ত তারি পথ চেয়ে বসে আছে। তারা ত জানে না এ পতাকা অচল আজকাল। বাড়ী পড়ে যায় এর ভারে।

ফুটপাতে বসেও এই দুপুর রোদে তন্দ্রা আসে। দীর্ঘদিনের অর্ধাহার ক্লান্তি মাথার ভেতরে জট পাকাতে থাকে কতগুলো হিজিবিজি চিন্তা অস্পষ্ট ধোঁয়ার মত—রুগ্ন অনুভূতিতে ভারী ভাল লাগে যেন—অনেকটা নেশা করার মত।

প্রচণ্ড রোদে জনবিরল পথঘাট। অনেকটা ঢিমে তালে লোকজন যাতায়াত করছে।

দূরে একটা ট্রাম আসে অকারণে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে। লাফিয়ে ওঠে অমু। ট্রাম ষ্টপেজে এসে দাঁড়ায়। অনেকখানি ছুটে যান্ত্রিক দেহটা যেন হাঁমফাঁস করতে করতে এসে থমকে দাঁড়ায়।

দু'চারজন লোক লাফিয়ে নীচে নামে।

—এই যে পতাকা স্যার, হাতে কাটা সুতোর—কিন্তু লোকটা মুখোমুখি দাঁড়াতেই চমকে উঠল। কবে যেন—মনে হল অনেক চেনা ছিল, অনেক অন্তরঙ্গ মুহূর্ত যেন কাটিয়েছে এরই সঙ্গে। তবু—দামী সেণ্টের একটা গন্ধ সমস্ত চেতনাকে যেন আচ্ছন্ন করে তুলল।

এক মুহূর্ত—ট্রামটা ছেড়ে দিল ঘণ্টা দিয়ে। যেন চমক ভাঙল অমুর। অনিল সিংহ?—বেশ মনে পড়েছে মোটা খদ্দরের জামা হাঁটু পর্যন্ত। কাপড়ের নীচে নোংরা পায়ে সস্তা কম দামী চপ্পল। নিরীহ, সত্য ভীরু ছেলেটি এককালে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল অমুর।

বুকে জড়িয়ে ধরতে এগোচ্ছিল অনিল সিংহ কিন্তু মুহূর্তের উপস্থিত বুদ্ধি—নিজের সিল্কের জামার দিকে এক নজর চেয়ে সহজ হয়ে এল। রক্ষা করল নিজেকে: উঃ কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা—এতদিন কোথায় ছিলিরে? অমুকে কোন কথা বলতে না দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

আমতা আমতা করে কিছু বলতে গেল অমু: আমি—আমি—

—চল চল, ভারী রোদ। এক জায়গায় বসে ঠাণ্ডা হয়ে তোর কথা শুনব। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অমুর হাতটা ধরে ফেলল।

তারপর একটা হোটেলে ঢুকে একগাদা খাবারের অর্ডার দিয়ে সুস্থির হয়ে একটা নিশ্বাস ফেলল: উঃ। হ্যাঁ, ভাল কথা, কি করছিস এখন?

হাতের পতাকাগুলো নিয়ে ঘামছিল অমু।

—ও গুলো কি? হাত বাড়াল অনিল সিংহ: দেখি, দেখি, খদ্দরের? আধমন ভারী হয় বৃষ্টি হলে, তারপর আর রক্ষা নেই বাড়ী ভেঙে পড়বেই। হাঃ হাঃ। প্রাণখোলা হাসি হাসল অনিল সিংহ: কোন পার্টিতে কাজ করছিস?

বয়টা এসে খাবারগুলো সব দিয়ে গেল।

—নে, নে, সুরু কর। বলে নিজেই একটা প্লেট টেনে নিল। একটুকরো মাংস কাঁটা দিয়ে গেঁথে মুখে তুলতে তুলতে বলল: না মন্দ নয়। তবে যতটা ভাল হওয়া উচিত ছিল—ফিরপো, গ্রাণ্ডের কথা বলছি। আমি কি করছি কই জিগ্যেস করলি না ত? অমুকে কিছু বলতে না দিয়ে অন্তরঙ্গের সুরে আবার বলল: আজকাল টু পাইস হচ্ছে। বাবা শিগ্‌গির মিনিষ্ট্রিতে ঢুকছেন। সেণ্ট্রালে বাবার কি রকম হোল্ড আছে জানিস ত? বাবাই বললেন, কেন বসে আছিস আমার সঙ্গে একটু ঘোরাঘুরি কর। রায় কাকাকে ধরে সেণ্ট্রালে কণ্ট্রাক্ট পেলাম আড়াই লাখ টাকার। তারপর শিগ্‌গিরই মেডিসিনের একমাত্র ডিলার হচ্ছি আমি—

বাবা রায় কাকাকে বললেন: ছেলেমানুষ চালাতে পারবে ত এত বড় ট্রানজেকসন—

তার উত্তরে রায় কাকাকে ধরে এবারে সমস্ত গভর্ণমেণ্ট প্রেসে ফ্ল্যাগ সাপ্লাইংএর কণ্ট্রাকট নিলাম। ইটালিয়ান সিল্ক—১৭৷৷০ টাকা পার ইয়ার্ড।

গলায় যেন কি হয়েছে অমুর কিছুতেই খাবারগুলো নামতে চায় না।

—একটা মজা দেখবি—বলে পকেট থেকে একটুকরো সিল্কের কাপড় বার করল: চিনিস জিনিষটা?

—না। মাথা নাড়ল অমু।

—অর্ডিনারী জুট এ্যাণ্ড কটন কম্বাইণ্ড সিল্ক। ১।০ গজ চাঁদনীতে, অঢেল পাওয়া যায়। আবার প্রাণখুলে হাসল অনিল সিংহ। যাবার সময় বলল: কাল যাস কিন্তু আমার বাড়ীতে। একটা পার্টি আছে। বড় বড় লোকজন আসবে। দেখবি একটা জিনিসের মত জিনিষ করছি। কিম্বা অন্য কোন দিন রাইটার্স বিল্ডিংএ খোঁজ নিলেই দেখিয়ে দেবে

আমার চেম্বার। তারপর একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে থামিয়ে উঠে পড়ল অনিল সিংহ।

তবুও স্বপ্ন ছিল একদিন। চোখের কোণা চক্‌চক্‌ করত আনন্দে। দেশ স্বাধীন হবে। দুঃখ ঘুচবে। পেট ভরে, মুখ ভরে ভাত পাবে। গরম ভাতের সোঁদা গন্ধে জড়িয়ে আসে চোখ। মানুষের মত বাঁচবে। মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে লজ্জায় জিভ কেটে চোখ বুজতে হবে না। দাদাকে দরজা বন্ধ করে গামছা চাইতে হবে না—শুধু এই টুকু দয়া তাদের কেউ করেনি আর দয়া চায় না সে। মুখখানা আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে আসে। শীর্ণ হাতের মুঠোয় জাগে বজ্রের শক্তি। বিড়বিড় করে বলে: সব-শালাকেই চিনে নিয়েছি, কিছুতেই ভুলব না।

মা বললেন: এত দেরী হল যে? তারপর কাছে সরে এসে কানে কানে জিগ্যেস করলেন: হ্যাঁরে কিছু হল? তা আনলি কিছু অ্যাঁ?

—হ্যাঁ। এনেছি—পেয়েছি কিছু। টাকা খানেক হবে। তা ধরো—দু' আনা কমিশন টাকা প্রতি তা হলে সাড়ে আট টাকায় এক টাকা এক আনা। তা থেকে এক আনার মোম এনেছি। মোম রাত্রে জ্বালাতে হবে ত।

—মোম? কেন নবাবী কেন? অত নবাবী কিসের শুনি? চার পয়সায় এত কটি মুড়ি হত—আলো নিয়ে কি হবে? এত কটি মুড়ি হত জানিস, একদিন ভাল করে চলে যেত আমার। আর টাকা—

—আছে আমার কাছে। কিছু আনতে হবে নাকি?

—কই দেখি? চক্ চক্ করছে মায়ের চোখ। জিভ চাটছেন তিনি।

হাত বাড়িয়ে দিল অমু: এই যে টাকা।

খপ্ করে কেড়ে নিলেন টাকাটা তারপর বললেন: কিছুতেই দেব না। না খেয়ে থাকবি। থাক তাই। না খেয়ে মরে যা তোরা। এদিয়ে

কাপড় কিনব আমি—খাবার কিনব—ওষুধ কিনব। সব কিনব আমি সব কিনব। দেখ টাকাটা কেমন চক্‌চক্‌ করচে। দেব না কিছুতেই দেব না।

কেমন যেন চমকে গেল অমু। পাগল হয়ে গেল নাকি? মা পাগল হয়েছে।

বিড়বিড় করে তখনো বলছেন মা: এই টাকা দিয়েই তোর দাদার চোখ ভাল করব। ডাক্তার সাহেব দেখিয়ে ভাল করব। হ্যাঁ—হ্যাঁ। হাসছেন মা: দেখিস তুই, তোর দাদাকে কাপড় কিনে দেব দেখেনিস। হিঃ হিঃ করে হাসছেন: দেখে নিস তুই দেখেনিস। হ্যাঁ বাবা চক্‌চকে টাকা! আঁচলে বাঁধতে যান একবার। আবার লুকোবার চেষ্টা করেন।

অন্ধ চোখেই বাইরে বেরিয়ে এলেন দাদা। থর থর করে কাঁপছে সারা শরীরটা। সাদা ড্যাব ড্যাবে চোখে খুশী উপছে পড়ছে যেন: শোন্‌ শোন্‌ এদিকে একবার আয়ত অমু।

সরে আসল পায়ে পায়ে অমু: কি?

আস্তে জিগ্যেস করল: দেশ ত স্বাধীন হয়েছে, অনেকখানি মুড়ি দেবে না চার পয়সায়? কিরে কথা বলছিস না কেন? আচ্ছা চার পয়সা না হোক দু পয়সার এনে দে। বড্ড খিদে পেয়েছে। থর থর করে কাঁপছে দাদার শরীরটা। ড্যাব ড্যাবে চোখ দু'টো অনুজ্জল আর মৃত্যুর মত স্থির। ইচ্ছে করে অমুর দাদার গলা টিপে ধরতে মুড়ি খেয়ে বাঁচার চেয়ে মরে যাক্‌—দাদা মরে যাক্‌। দু'পয়সার মুড়ি সে কিছুতেই আনবে না। মুখটা কঠিন হয়ে আসে অমুর।

দেশের জন্য চোখ হারিয়েছে দাদা। কিছু দেখতে পায় না। ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলে: এতদিন পরেই আজ একবার চোখের জ্যোতি ফিরে পেতে ইচ্ছে করে। একবার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে দেশটা কেমন স্বাধীন

হল ? মানুষগুলো আমার মতই আছে না অন্য কিছু হয়েছে ? সূর্য আগের মত পূবে ওঠে আর পশ্চিমে অস্ত যায়—আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করে।

দাঁতে দাঁত চেপে বলে অমু: বেশ হয়েছে কিছুই দেখতে পাওনা, কি দেখবে, কিছু দেখার আছে ? নেই কিছু। গোটা দেশটায় খুঁজে মানুষ পাবে না, একটাও মানুষ পাবে না। একটু থেমে আবার বিড়বিড় করে বলে: সব শালার চোখ অন্ধ করে দাও ভগবান—সব শালাকেই অন্ধ করে দাও, পথে চলতে চলতে কাঁহাতক চোখ বোজা যায়—দাদার মতন কেউ যেন কিছু না দেখতে পারে।

দাদাকে সঙ্গে করে ছাদে নিয়ে আসে অমু। বাঁশে জড়ানো দড়ি হাতে দিয়ে বলল: এই যে দড়ি পতাকার দাদা।

দাদা টানতে টানতে এক সময় জিগ্যেস করল: হয়েছেরে ? উড়ছে ?

—হ্যাঁ। বলল অমু।

—ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে নারে ? আমাদের কালে ছিল চরকা আর তোদের কালে চক্র। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে না ? আনন্দে দু'চোখের সাদা মণি চক্‌চক্ করছে। যেন সব দেখতে পাচ্ছে। অন্ধ চোখ থেকে ঝরে পড়া জলের ফোঁটাগুলো সকালের রোদে চিক্‌চিক্ করতে থাকে। ঠোঁট নড়ে, দাদা কি বলে কে জানে ? দৃষ্টি ফিরে চায় না, দু'পয়সার মুড়িতে পেট ভরে না তার অভিযোগ করে কিনা বোঝা যায় না।

ওপরের দিকে একবারো তাকাল না অমু। দেখল না কেমন উড়ছে পতাকা। তাকালেও যে কিছু দেখতে পাবে না ও জানে। বাঁশের সঙ্গে শুধু দড়ি বাঁধা। কালকে ফেরার সময় ও নিজেই সব পতাকা বিক্রী না হওয়াতে ফেরৎ দিয়ে এসেছে দোকানে।

দুঃখ

মাঝে মাঝে অবাক লেগেছে দেবীদাসের। অবাক লেগেছে ড্যাল-হাউসির চওড়া রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে। অবাধ্য বিস্ময়ে চোখের তারা ঠিকরে পড়তে চেয়েছে। বাঁকা শীর্ণ ঘাড় তুলে প্রশ্ন করেছে। পৃথিবীতে এত অন্যায় এত অবিচার--

শীতের দুপুর। সূর্যের অকৃপণ আলোর বৃষ্টি। রাস্তার পিচ তেতে আগুন আর এখানে ওখানে পুরনো ঘায়ের মত ফুলে উঠেছে যেন।

মাথার ভেতরটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করছে দেবীদাসের। দপ্ দপ্ করছে রগের কাছটা। ভাল করে মনে পড়ছে না কিছু। কেমন আচ্ছন্নের মত লাগছে। একবার জিভটা চুষল দেবীদাস। মুখের থুতু শুকিয়ে কেমন আটা হয়ে গেছে। চট্ চট্ করছে মুখের ভেতরটা। জল—এক গ্লাস জল পেলে হয়ত কিছু ভাল হত। একবার এদিক ওদিক তাকায় দেবীদাস। একটা জলের কল—একটা জলের কলও নেই কাছে পিঠে। কি অসহ্য তৃষ্ণা? বুকের ভেতরটা যেন ফেটে যেতে চাইছে।

কাপড়ের কোঁচা দিয়ে মুখ মুছল দেবীদাস। কেমন জ্বালা জ্বালা করছে মুখের চামড়া। একটা অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে কোন অলৌকিক শক্তিতে একটা ভীষণ কিছু—

মাঝে মাঝে কি যেন মনে হয় দেবীদাসের। কেমন যেন করে সারা শরীরটা মনে হয় অব্যক্ত জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে বুকের ভেতরটা। ইচ্ছে করে ভীষণ একটা চীৎকারে কেঁদে ওঠে—নিজের ওপর কেমন বিশ্রী ধারণা চেপে বসে—সে বুঝি সত্যি পাগল হয়ে গেল? নিজের হাতে একবার মাথাটা নাড়া দেয় দেবীদাস। ঝিম্ ঝিম্ করছে মাথার ভেতরটা। একবার এদিক ওদিক তাকায়। নাঃ সবই ত চিনতে পারছে। ওই ত একটা গাড়ী চলে গেলে ঝলসে গেল দুপুরের রোদ! চিড় খেল হটাৎ আলোর ঝলকানিতে। ওই ত আরো একটা। ভেতরের লোকগুলোকে চোখে পড়ল। গুণতেও পারল ক'জন তারা। গাড়ীর নামটাও চোখে পড়ল। কি যেন নাম প্যাকার্ড! ওই ত আরো একখানা। এখানা বুইক। সামনের বাড়ীখানা নীচ থেকে ওপরতলা পর্যন্ত গুনে গেল দেবীদাস। না মাথার গোলমাল নেই। তবে—

আবার অসহ্য তৃষ্ণার ভাবটা যেন বুকের ভেতর চাড়া দিয়ে উঠল। জিভটা টানছে ভেতরের দিকে। একবার মুখের থুতু দিয়ে দুপুর রোদের ফাটা ফাটা চামড়া ওঠা ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে নিল দেবীদাস। পেটের ভেতরটা যেন কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। মনে হোল পেটের সমস্ত নাড়ী গুলো কে যেন টানাটানি করে জট খুলতে গেছে। দু'হাত দিয়ে পেটটা চেপে ধরে দেবীদাস। একবার নয়, দু'বার নয় অনেক—অনেকবার পকেট হাতড়ে দেখেছে দেবীদাস। টিপে টিপে, নেড়ে চেড়ে দেখেও সন্দেহ যায় নি। পকেটের ভেতরকার কাপড় টেনে বার করেছে কিন্তু না—দু'চার আনা পাওয়া ত দূরের কথা একটা ফুটো তামার পয়সা পর্যন্ত চোখে পড়েনি।

তবু কেন জানি আবার পকেটে হাত দিল দেবীদাস। ভুল হতেও ত পারে? অন্ততঃ একটা কিছু পেটে দেবার মতন থাকলেই চলবে। অন্ততঃ দু'আনা না হোক চারটে পয়সা কিংবা একটা পয়সা থাকলেই চলবে। ওই ত দূরে একটা চিনে বাদামওয়ালা গাছের ছায়ায় ঝুড়িটা নামিয়ে বসেছে। আরো কিছু দূরে দু'একজন ছোলা মটর সেদ্ধ নিয়ে বসে আছে। এখান থেকে দেখতে পায় দেবীদাস। একটা চেনা স্বাদ, কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ আর ঝাল নুনের চিরপরিচিত গন্ধ জিভের ডগায় শিরশিরানি আনে—

এক একবার লজ্জার মাথা খেয়ে ভিক্ষে করতে ইচ্ছে করে দেবীদাসের। ইচ্ছে করে বেশ একটা চকচকে গাড়ীর মালিক দেখে তার কাছে হাত পেতে বসে—

ভিক্ষে করা এর চেয়ে কি লজ্জাকর? এর চেয়েও কি ঘৃণার? দূরে চানাচুরওয়ালা আশে পাশে অফুরন্ত লোকজনের ব্যস্ততা, অবিরাম নতুন নতুন মডেলের গাড়ীগুলো ছিটকে যাচ্ছে দুপুরের রোদে আর তার আরোহীরা কেমন মোটা মেদবহুল চেহারা, দুপুরের বিশ্রামে ফোলা ফোলা চোখ আর অবিন্যস্ত চুল। তাদের কাছে গিয়ে হাত পেতে ভিক্ষে চাইবে দেবীদাস?

ওই ত নামল একজন গাড়ী থেকে। দেবীদাস ডাকল: এ জি শুনিয়ে জেরা শুনিয়ে—

অবাক হয়ে ফিরে তাকায় লোকটা। চোখে মুখে কেমন অবহেলার ভাব।

দেবীদাস কি চাইবে কিছু? সামান্য কয়েক আনা? ওই ত দূরে চানাওয়ালা বসে আছে এখনো। ঝাল নুনের স্বাদটা জিভের আগায় কেমন সুরসুরানি দিতে সুরু করে। হঠাৎ মনে পড়ে বাড়ীর কথা— চোখের সামনে ছবির মত ভেসে ওঠে কতকগুলো রুক্ষ মুখ। মায়ের

চোখের ভুরু তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে কঠিন জিজ্ঞাসায়, একটা কঠোর প্রতিজ্ঞায়—। অথর্ব বাবা—অপ্রাচুর্য যাকে সংগ্রামী করে তুলেছে। আরো আছে কুমারী বোন, স্কুল ছাড়ানো বকাটে ভাই—দৈনন্দিন সংগ্রামের নির্মম সৈনিক।

চমকে পেছিয়ে আসে দেবীদাস। একি করতে যাচ্ছিল? কার কাছে হাত পাতছিল সে? পুরু মাংসের নীচে একটা কুৎসিৎ মাংসাসী মুখ যেন দেখতে পেল দেবীদাস। লাফিয়ে সরে এল। থুতু ফেলল খানিকটা পরম ঘৃণায়।

লোকটা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর কি যেন বিড় বিড় করে বকতে বকতে চলে যায়।

দূরে গাছের পাতা দুলছে। শীতের আমেজে ছোট বেলা ফুরিয়ে আসছে ক্রমে। গাছের পাতায় বিদায়ী দুপুরের অপূর্ব বর্ণোৎসব।

মনে পড়ে মায়ের কথা। হতাশায় ফ্যাকাশে চোখের তারায় কেমন ড্যাবড্যাবে চাউনি। তবু কেমন কঠিন বিদ্রোহ এই দুঃসহ জীবনের ওপর। আজও কি খাওয়া হয়নি মায়ের? ভাত জোটেনি একমুঠো সকলের খাওয়ার পরে? ছোট ভাইটা কাঁদছে নাকি এক ফোঁটা বার্লির জন্য? আরো একটা মেয়ের কালো আর শান্ত চোখের চাউনি নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে সমস্ত দারিদ্র আর এই পুঁজিবাদী সমাজের সমস্ত অন্যায়?

একবার এই সময়ে, এই আগুন দুপুরে, কর্মক্লান্ত শহর, আকাশচুম্বী প্রসাদমালার ওপরে অলস পায়রার ডাক। ট্রামের তারে দোল খাচ্ছে দু'একটা কাক। গাছের পাতায় অদ্ভুত আলোর সোণা সোণা রং। একবার হুটুবিহারী বাই লেনে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে এই প্রখর রোদে দাঁড়িয়ে দেখতে সেখানকার সমস্ত হাহাকার, কান্নার ইতিহাস। সমস্ত ব্যর্থতার ইতিকথা সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে।

—এই যে দেবীবাবু এখানে কি করছেন ?

অবাক হল দেবীদাস। ভারী অবাক লাগল। ফিরে তাকাল। আরে অনুপমা, কতদিন দেখিনি তোমায়। আকাশের উজ্জল প্রচ্ছদপটে সূর্যের আলো ঠিকরে আসছিল এতক্ষণ। তার তেজ কি আস্তে আস্তে কমে আসছে নাকি ? না অনুভব করতে পারছে না দেবীদাস: সারাদিন না খেয়ে থাকলে অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায় নাকি ? কই শোনেনি ত—সেই যে কে যেন ৬৪ দিন না খেয়ে ছিল, জল পর্যন্ত ছুঁয়ে দেখেনি—আজ অন্ততঃ বিশ্বাস করতে চায় না। তবু অনুপমা কাছে আছে, এই দুপুর রোদে অদ্ভুত লাগছে।

—কি খবর দেবীবাবু এখানে দাঁড়িয়ে ? কি আশ্চর্য পাখীর স্বরের মতন মনে হচ্ছে কথাগুলো।

অনুপমা কি কথা কইছে নাকি ? এবার ফিরে তাকায় দেবীদাস: এই মানে দাঁড়িয়ে আছি—কথা বলতেও কষ্ট হয় যেন, কেমন খিঁচ ধরছে পেটে। তবু অনুপমা এত কাছে। চুলের গন্ধটা যেন পাওয়া যাচ্ছে।

—কারো জন্যে অপেক্ষা করছেন নাকি ?

অনুপমা কি হাসছে ? কেমন যেন শিরশির করে কানের ভেতরটা। সত্যি কি কারো জন্যে অপেক্ষা করছে দেবীদাস ? কই না ত। কিন্তু কি বলবে অনুপমাকে—চাকরী পায়নি আজ পর্যন্ত ? কাল পর্যন্ত চলেছে কোনমতে, অন্ততঃ ভাতের হাঁড়িতে জল ভরতে হয়েছে, আর তার গায়ে আগুনের আঁচ লেগেছে। কিন্তু আজ ? মুটুবিহারী বাই লেনের একটা সংসারে আজ যে আর আঁচ পড়বে না সেটা জানে দেবীদাস। সকাল বেলাই কে যেন কাঁদছিল। ভাঙা গলায় বেসুরো সানায়ের পোঁ ধরার মতন কেমন যেন ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজ। কানের ভেতরটা কেমন যেন করছিল—সহ্য করতে পারেনি দেবীদাস। ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। তখনও ভাল করে লোক চলাচল হয়নি। তারপর

কত রাস্তা, রোড, লেন, বাই লেন, কত দোকানপাট অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরেছে দেবীদাস। •কখন ঘড়ির কাঁটা ঘুরে ঘুরে আড়াইটেতে এসে ঠেকেছে খেয়ালই করেনি। অনুপমা কি কিছু বুঝতে পেরেছে? রোদ কি ছায়ায় গলে গেছে? না অনুপমার ভেজা চুলের হাওয়া গায়ে লাগছে? গাছের পাতার রং কি আশ্চর্য সবুজ? কিন্তু দোর থেকে দোরে কেন এ উঞ্ছবৃত্তি? আবার পেটটা কেমন যেন করছে। খিদে পেয়েছে। চিনেবাদামওয়ালাটা আসছে বুঝি। তবু অনুপমা পাশে। মাথার তেলের গন্ধ আসছে বুঝি বাতাসে।

—না, না, ঠিক কারো জন্যে নয়। এবার হাসতে চেষ্টা করে দেবীদাস। গালটা চড়চড় করছে। টান লাগছে চামড়ায়। তবু হাসে দেবীদাস। মনে হয় হাসি বুঝি ভাল করে ফোটে না। তবে? সত্যি হাসছে বুঝি এবার : তবে অভয় দিলে বলি। কোঁচার কাপড় দিয়ে মুখটা মুছে নিতে নিতে বলে দেবীদাস। না কোন ভয় নেই। বুঝতে পারেনি অনুপমা। না হলে এত হাসি হাসি মুখ। না, না, ওই ত কি যেন বলছে অনুপমা।

—নিশ্চয় অভয় দিচ্ছি—না বললে কিন্তু ভাল হবে না বলে দিচ্ছি—কৃত্রিম কোপদৃষ্টিতে তাকায় অনুপমা।

ভারী ভাল লাগে দেবীদাসের : আপনার জন্য। হয়ত সাহস করে বলে ফেলে দেবীদাস। অনুপমার দিকে তাকায়। রোদে কি লজ্জায় বোঝা গেল না গালদুটো টুকটুকে লাল।

—চলুন এগোনো যাক। বলে অনুপমা কবিতা পড়ার মত অদ্ভুত সুরে।

—এগোবো কতদূর? আমায় আবার—বাধা দেয় দেবীদাস।

আর চলার ক্ষমতা নেই যেন। কেমন ভারী ভারী ঠেকছে পায়ের মাস্‌লগুলো।

—না, না, চলুন একটু। বেশীদূর না কার্জন পার্ক। কেমন আদুরে গলায় গলে গলে পড়ছে স্বর।

অসহ্য যন্ত্রণা মনে হতে লাগল দেবীদাসের। কে যেন একটা ভোঁতা করাত দিয়ে পায়ের মাস্‌লগুলো কুরিয়ে কুরিয়ে কাটছে। না তা নয় বোধ হয় ভেতরকার সূক্ষ্ম নার্ভগুলো পাকিয়ে একাকার হয়ে গেছে। কিংবা তাও নয় বোধ হয় উই পোকার মত কিছু কুরে কুরে খাচ্ছে ভেতরটা। নিজেকে সংযত করে দেবীদাস। আর কত দূর? এখানে এত লোকজন কেন? বেশ হত একটা ফাঁকা সরু রাস্তা পেলে। আর কত দূর? দেবীদাস খোঁড়াচ্ছে। ডান পাটা নাকি ঠিকমত পড়ছে না। একটা পা কি ছোট বড় হয়ে গেল নাকি? না এসব মনের ভুল। মাথার ভেতরটা যেন কেমন করছে। পানের দোকানের আয়নায় মুখটা দেখে নিতে পারলে কিন্তু বেশ হত। অনুপমা কি কিছু বলছে? কোন কথা কবিতার মত সুর করে। এখানে এত ঠাণ্ডা কেন? জ্বর আসেনি ত? ওই ত আরো একটু—আরো একটু—মাঠের সবুজ ঘাস দেখা যাচ্ছে। সুপ্ত ক্ষিদেটা আবার যেন চাগিয়ে উঠল।

—অত জোরে জোরে হাটবেন না, আমায় যে রীতিমত দৌড়ুতে হচ্ছে।

—ও, একটু জোরে হাঁটছি বুঝি? আমার আবার ছোটবেলা থেকেই অভ্যেস। তাছাড়া মেয়েদের মত ঠিক মেপে মেপে পা ত আর জীবনভর ফেলতে পারি নি। আমরা একটু বেহিসেবী চিরকাল।

তবুও হকারদের চালাগুলো ঘুরে ঘুরে কাপড় কিনতে হল অনুপমার জন্য। কিন্তু তখনো লক্ষ্যে পড়েনি অনুপমার। কিন্তু হঠাৎ মাঠে ফিরে যাবার সময় অবাক হয়ে বলল: একি, আপনি খোঁড়াচ্ছেন কেন? পায়ে কি হল?

—পায়ে? অবাক হয় দেবীদাস। সত্যি কি হল পায়ে? নিজের পায়ের দিকে তাকায় একবার। মনুমেণ্টটা দেখা যাচ্ছে বুঝি এখান থেকে? কত উঁচু ওটা? ওর ওপর থেকে সমস্ত কলকাতা দেখা যায় বুঝি? তা হবে। অনুপমা কি তাকিয়ে আছে এখনো? নিজেই কখন খোঁড়াতে সুরু করেছে—আপশোষ হতে থাকে, কেন আগে লক্ষ্য করেনি, তাহলে ত—। হাসিমুখে তাকায় ওর দিকে: না, তেমন কিছু না। ব্যাপারটা কি—ট্রামে যায় পকেট মারা। মানে ব্যাগ শুদ্ধ তুলে নিয়েছে সমস্ত কিছু। তারপর আর কি এমনি পকেট। একটা পয়সা নেই। কণ্ডাক্টর পয়সা চাইবে—তার আগেই চলতি ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে—পাটা যেন কেমন, না তার জন্ত বিশেষ কিছু—

—সে কি? অবাক হয় অনুপমা: আগে বলেননি কেন? আমি শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট দিলাম। আমি ভারী স্বার্থপর—কেমন কাঁদ কাঁদ শোনায় অনুপমার গলা।

রসিকতার লোভ ছাড়তে পারে না দেবীদাস: তার চেয়ে আরো বেশি কষ্ট হচ্ছে না খেতে পেয়ে। সেই সকালে বেরিয়েছি একেবারে কিছুই খাওয়া হয়নি। মনে মনে হাসে দেবীদাস। কেমন মোক্ষম চালটি মারা হয়েছে। দেবীদাসের অনুমান মিথ্যে হল না।

—তবে কিছু যদি মনে না করেন, আপনাকে এত বিরক্ত করলাম আরো করবো। সেই সকালে আমিও বেরিয়েছি এখন পর্যন্ত কিছুই খাওয়া হয়নি। চলুন একটু চা খাওয়া যাক।

—চা? বলছেন যখন আপনারো প্রয়োজন, আমার নিজের জন্ত অবশ্য বাড়ী গিয়েই চলত। ট্রাম ভাড়াটা কিন্তু আপনারই দিতে হবে তা বলে রাখছি—

শুধু চা নয় আনুষঙ্গিক কিছু জুটল দু'জনেরই। সমস্ত ক্লান্তি কাটিয়ে যেন নতুন জীবন পেল দেবীদাস। মাংসের হাড়গুলো চিবুতে চিবুতে

ছোট ছোট ভাইগুলোর কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল বাবা, মায়ের কথা আর আইবুড়ো বোনটা যার কুমারী জীবনের মেয়াদ আর ফুরুচ্ছে না, তবু মন্দ লাগল না।

তারপর এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিল অনুপমা। একটা দেশলাই। আর চার আনা পয়সা ট্রাম ফেয়ার।

—এত যে ধার দিলেন আর যদিফেরৎ না দিই। হাসলদেবীদাস।

—আমি ত কাবুলিওয়ালা নই যে আপনাকে খুঁজে বার করবো। আর সবাই কি প্রত্যাশা নিয়ে দেয় দেবীবাবু। চোখের কোনাটা চিক্ চিক্ করছে না অন্য কিছু। আবার বলল অনুপমা : কিন্তু আপনার মনে রাখার মতন যথেষ্ট কিছু করতে পারিনি।

উত্তর দেয় না দেবীদাস।

—আপনার যে বীরত্ব আমরা দেখেছিলাম যে আত্মত্যাগ, আপনাকে ত মাথায় তুলে রাখা উচিত। আপনি যখন অনন্ত পোদ্দারকে মুখের ওপর জবাব—

এবার একটু আগ্রহ দেখায় দেবীদাস: আপনি ছিলেন নাকি তখন?

—বারে আমি ত আপনার রুমেই ছিলাম! এই ত সেদিনের কথা মনে নেই?

—মনে আছে।

—সেই যে আপনার কার যেন অসুখ হয়েছিল আর ওষুধের জন্য ব্ল্যাকের দাম চেয়েছিল। তারপর পুলিশের ভয় দেখিয়েছিলেন আপনি খবর দেবেন বলেছিলেন—

আবার মনে পড়ে দেবীদাসের। অনন্ত পোদ্দারের মেদবহুল চেহারাটা ভেসে ওঠে। একেবারে কোলের ভাইটা ভুগছিল টাইফয়েডে। কি একটা ওষুধ যেন নতুন বেরিয়েছে। ভারী ধন্বন্তরী। ওরাই ছিল

এজেন্ট। একটা কোর্স দেবার মতন চেয়েছিল দেবীদাস। সমস্ত কথা খুলেই বলেছিল, ছোট ভায়ের ভীষণ ব্যামার—বাঁচে না বোধ হয়। লক্ষপতি অনন্ত পোদ্দারের দয়াও হয়েছিল কথা শুনে। দশ টাকা দিয়েছিল ফল খেতে। কিন্তু ওষুধ? ওষুধের নাকি অনেক দাম ওটাকি আর দু'একটার দেওয়া যায়? কিন্তু বাড়ী গিয়ে দেবীদাস দেখল ভাই মরে গেছে।

মনে নেই কিছু। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। একটা উন্মত্ত ক্রোধে পাগলের মত ছুটে গিয়েছিল। হাতে সেই বেশী টাকায় কেনা ওষুধ আর দশ টাকায় কেনা ফলের ঠোঙ্গা। মুখের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, আর কি অসহ্য ঘৃণায় সারাটা শরীর কুচকে এসেছিল। কি ঘৃণ্য সরীসৃপের মত মনে হয়েছিল তাকে। অনন্ত পোদ্দারের মুখের ওপর রেজিগনেশন লেটারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

ওখানে তখন ভীষণ হট্টগোল। চেয়ার ছেড়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সবাই। সমস্ত ক্লার্ক, একাউন্টটেন্ট, এমন কি টাইপিষ্ট অনুপমা সেও বুঝি এসে দাঁড়িয়েছিল অবাক চোখে। লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? অমন লোকটা শান্ত, ধীর। বাঁধা ধরা নিয়মে আসা যাওয়া করত ঘড়িব কাঁটায় কাঁটায়। কাজে কমপ্লেন ছিল না। একাউন্টে গণ্ডগোল করেনি এক পয়সা কোনদিন। তবে—অবাক চোখে এসে দাঁড়িয়েছিল সবাই।

আজ পার্কে বসে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে যেন কেমন লাগে। ভারী বিশ্রী মনে হয়। পাশে অনুপমা দূরে আকাশের শেষ প্রান্তে অস্তগামী সূর্যের ম্লান আলো গাছে গাছে আর ঘরমুখো পাখীর দল, আরো কয়েকদল লোক—ভারী ভাল লাগে। একটু যেন লজ্জিত দেবীদাস: আপনারা কিছু মানে—সেদিনের জন্য আমাকে ভুল ভাবেননি ত?

—না না। থামিয়ে দিয়ে বলে অনুপমা: আপনি ঠিকই করেছিলেন আমরা সবাই মানে ষ্টাফের সবাই আপনার কথা ভালোভাবে আলোচনা করেছি কতদিন। কি বলব আনন্দে আমাদের বুক ফুলে উঠেছে—

আবছা অন্ধকারে একবার তাকায় দেবীদাস অনুপমার দিকে। কেমন যেন উজ্জল দেখায় তার সারাটা মুখ।

অনুপমা আবার বলে: আমাদেরও কি সমস্ত অপমান গায়ে বাজে না। এক একবার ইচ্ছে করে দিই ছেড়েছুড়ে—

একটু হাসে দেবীদাস: সত্যি?

—হাঁা সত্যি। শুধু আমি নয়—সবাই। কিন্তু উপায় নেই। তিন চারটে প্রাণী চেয়ে আছে আমার দিকে। মাসান্তে যে কটা টাকা পাই তাতে কোন মতে চলে যায় খেয়ে না খেয়ে। আপনার এই প্রতিবাদে আমাদের সকলেরই নীরব অংশ আছে।

এখন এই আবছা অন্ধকারে অনুপমাকে ভারী আপন বলে মনে হয় দেবীদাসের। আর কোন লজ্জা থাকে না দেবীদাসের মনে, থাকে না কোন সংকোচ। সকলেই ত তার দলে, তারই পাশাপাশি। এবার হেসে কথা বলে দেবীদাস: কিন্তু—এখন যে আর চলে না সংসার প্রায় ছ'মাস বসে যা কিছু ছিল ছোট ভাইটার চিকিৎসায় খরচা হয়ে গেছে তাও ভাইটা মারা গেল আবার। মরেও গেল মেরেও গেল। হয়ত আবছা অন্ধকারে একটু কঠিন শোনায় দেবীদাসের গলা। হয়ত একটু নির্মম: তারপর বোঝেন ত অভাবের সংসারে রোগ যেন ছাড়তে চায় না। চাকরীও পাচ্ছি না। কি করে যে দিন চলছে—থামে দেবীদাস। কানের কাছে গমগম করতে থাকে তার নিজের কথাগুলো। কিন্তু কাকে সংকোচ করবে? অনুপমাকে সেও ত তারই দলে—একবেলা খায় আর একবেলা হয়ত না খেয়ে থাকে।

এরপরে আবার হুটুবিহারী বাইলেনে ফিরে যেতে হবে দেবীদাসকে। ফিরে যেতে হবে সেই দুঃখ দারিদ্র আর হাহাকারের মধ্যে। তবু জানে দেবীদাস, অন্যেরা তাকে স্বীকার করেছে। তাঁদের একজন বলে মেনে নিয়েছে।

অনেকক্ষণপর বলে অনুপমা: আপনার বাড়ী যাব একদিন—আগেও ভেবেছি অনেকদিন যাব—

—যাননি কেন? গেলেই পারতেন।

—হ্যাঁ, যাব। অবশ্য দু'একজন গেছল এর আগে খবর পাননি?

হ্যাঁ, খবর পেয়েছিল দেবীদাস। মা অবশ্য বলেছিলেন কারা যেন এসেছিল, তাকে খুঁজতে।

অনুপমা বলে: অনেক রাত হল এবার ওঠা যাক।

দু'জনে উঠে দাঁড়ায়।

ট্রাম রাস্তায় যেতে যেতে অনুপমা আবার বলে: ব্যবসা করুন না।

—টাকা—টাকা কোথায় পাব? বলে দেবীদাস।

—কেউ যদি দেয়?

—আপনি দেবেন নাকি?

—যদি দিই নেবেন না নাকি?

—তা নেবনা কেন কিন্তু এত লোক থাকতে আমাকেই বা দেবেন কেন?

ট্রামে তুলে দেয় অনুপমাকে। তারপর আবার সেই হুটুবিহারী বাই লেনে ফিরে চলে দেবীদাস।

কত রাত হয়েছে কে জানে? বাড়ীটা অসম্ভব নিস্তব্ধ। সবাই শুয়ে পড়েছে বোধহয়। দরজার কড়া নাড়তেই খুলে দেয় বোনটা। জিগ্যেস করে দেবীদাস: ভাত খেয়েছিস রুণু?

মাথা নাড়ে রুণু: হ্যাঁ, খেয়েছি।

—কিন্তু মা চাল পেলেন কোথায়? ফিস্ ফিস্ করে জিগ্যেস করে দেবীদাস।

—পাশের বাড়ী থেকে ধার এনেছেন।

আর কিছু বলতে পারে না দেবীদাস। ছেঁড়া কাপড় জড়ানো রুণুর দিকে তাকাতেও পারে না ভাল করে।

রাতে ভাত খাওয়ার পরে কি ভাবছিল যেন দেবীদাস। মনে পড়ছিল মায়ের অসহায় মুখখানা বারবার। পাশের বাড়ী থেকে চাল ধার করে এনেছেন। সেই ভাতের থালা তুলে দিয়েছেন দেবীদাসের সামনে। সে নীরব দৃষ্টিতে কি লজ্জা ছিল বুঝেছে দেবীদাস—এমন সময় রুণু এল পা টিপে টিপে: দাদা?

—কে? চমকে তাকাল দেবীদাস: রুণু এত রাতে কি চাই।

কিছু উত্তর দিতে পারে না রুণু চট করে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলে: আজকাল ত মেয়েরা চাকরী করছে দাদা, পাড়ার অনেকেই—

অবাক চোখে তাকায় দেবীদাস।

—সেটা ত আর খারাপ নয়—আমাকে একটা চাকরী জোগাড় করে দাও না?

—আচ্ছা পরে দেখা যাবে। আজ যাও এখন। আচ্ছা শিবু ফিরেছে। শিবদাস?

মাথা নাড়ে রুণু: হ্যাঁ, এই ত ফিরেছে। মেজদা কোথায় যেন কিসের কাজ জোগাড় করেছে একটা কারখানায়।

কথা বলে না দেবীদাস।

আবার বলে রুণু: আজকেই কি কালী-ঝুলি মেখে এয়েছে। মা বললেন খেয়ে শুয়ে পড়তে কিন্তু আবার বই নিয়ে বসেছে—

—আমার ভারী ঘুম পাচ্ছে এখন যা। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল দেবীদাসের, এবার শুয়ে পড়ল।

তারপর আবার সেই গতানুগতিক দিনক্ষয়।

মায়ের করুণ মুখ নির্বিকার, বাবার অসন্তোষ, ভাইদের হাহাকার। আর প্রত্যেক দিনের মত অপিস পাড়ায় টহল দেওয়া, একতালা থেকে পাঁচ তলা। প্রত্যেক অপিসে কর্মখালির খোঁজ নেওয়া—

তবু একদিন সকালে বাইরে বেরুচ্ছিল দেবীদাস—আর অনুপমা এসে হাজির। অবাক দেবীদাস: কি ব্যাপার এত সকালে যে?

—কিছু না এমনি এলাম বেড়াতে। বলেছিলাম, আসব।

—তা বেশ করেছেন।

—আপনার মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন—

মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল অনুপমা।

আশীর্বাদ করলেন মা: বেঁচে থাক মা, কিন্তু চিনতে পারলাম না ত—

—আমি যে অফিসে কাজ করি সেখানে কাজ করতেন। অনুপমার কাছে চাকরী ছাড়ার গল্প শুনলেন মা। সমস্ত কথাই বলল। আজকাল কেমন খাতির করে সবাই কেমন শ্রদ্ধা করে।

মা, রুণু, শিবদাস সবাই শোনে অবাক হয়ে। অদ্ভুত লাগে দেবীদাসকে তেজী ঘোড়ার মতন সোজা ঘাড়।

দেবীদাস বলে: জান অনুপমা, শিবু চাকরী পেয়েছে। এখন কিছুটা সংসারও চালাচ্ছে।

—সত্যি? কি করছে। কোন অফিসে? মা কি ভাবেন কে জানে। বলেন: সে এক সাহেবের অফিসে—হ্যাঁ, ভারী ভালবাসে সাহেব ওকে।

এবার হাসে দেবীদাস।

শিবদাস বলে: না না মা জানেন না—একটা কারখানায় কাজ নিয়েছি।

—বেশ ভাল ; আরো ভাল করে পাশ করা চাই কিন্তু।

মা লজ্জা পান। উস্‌খুস্‌ করেন উঠে যাবার জন্য।

অনুপমা বলে: জানেন মা আমার ভাই নিজের রোজগারে পড়ছে। জুতোর দোকানে পার্টটাইম কাজ করে। আমি ত আর ওকে পড়াতে পারছি না।

মা উঠে যান।

কিছু টাকা বার করে দেয় অনুপমা: এটা রাখুন—অফিসের কর্মচারীরা এটা দিয়েছে যেদিন ইচ্ছা ফেরৎ দিলে চলবে। এই কাগজটায় লেখা আছে সকলের নাম আর টাকার অঙ্কটা।

হাত পেতে নেয় দেবীদাস। একে একে সকলের নাম পড়ে। তারপর হেসে বলে: একজনের নাম যেন বাদ পড়ে গেছে। তার কাছ থেকে কিছু পাব ভেবেছিলাম।

হাসে অনুপমা। রাঙা হয়ে ওঠে গালটা।

শিবদাস বেরিয়ে আসে আস্তে আস্তে।

—তার নামে এটা জমা করে নিন। নতুন হাল্‌কার ওপর একটা সুন্দর ডিজাইনের আংটি বার করে দেয় অনুপমা।

অনুপমার আঙুলের দিকে তাকায় দেবীদাস। অনামিকায় একটা সাদা দাগ দারুণ স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে।

তোমার আমার সবার জন্যে

তাড়াতাড়িতে খুলতে গিয়ে ছিঁড়ে গেল জামাটা কাঁধের কাছটায় অনেকখানি। বিশ্রী একটা আওয়াজ হল—করাত টানার মত ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজ হল কানের কাছে। আর চম্‌কে উঠল উমানাথ, বুকের রক্ত খানিকটা যেন চলকে উঠল হৃদপিণ্ডের কাছটায়। কেমন যেন বিস্বাদ লাগল হঠাৎ। মাথা আর হাত দু'টো বার করে দেখল জামাটা সত্যি ছিঁড়ে গেছে খানিকটা লম্বালম্বি হয়ে।

এবার অপরাধীর মত তাকাল কল্যাণীর দিকে উমানাথ। বলল : গেল জামাটা—

কাছেই ছিল কল্যাণী, কি জন্য যেন—ছেলেটাকে দুধ দিচ্ছিল হয়ত, কথা শুনে তাকাল ভুরু কুঁচকে : কি হল ?

তক্তোপোষের ওপর ফেলে ছেঁড়া জায়গাটা তখন মুখোমুখি মেলাচ্ছিল উমানাথ, সেলাই করা যায় কিনা শুধু তাই নয় তাতে জায়গাটা কুঁচকে কতটা খারাপ হতে পারে মানে সরল কথায় বাইরে

থেকে চট্ করে বোঝা যায় কিনা—এবার বিরক্ত হয়ে বলল: বললাম ত জামাটা গেল একদিনেই, টিকলনা একটুও—

—তোমার যেমন তাড়াহুড়ো—জামাটার ওপর থেকে চোখ তুলে তাকাল উমানাথ কল্যাণীর দিকে।

—অফিস থেকে ফিরলে কোথায় ধীরে সুস্থে বসবে, জিরুবে, আস্তে আস্তে জামাটা খুলবে তা না—একটু থামল কল্যাণী। পরে আবার বলল: আর জামার কি দোষ দেব বল। একটা জামা অষ্টপ্রহর পরলে কদিনইবা চলে? তাও ত এক বছর হতে চলল—

—একবছর? বিশ্বাস না করলেও অবাক হল উমানাথ: একবছর বল কি? এর মধ্যে মাথা খারাপ হল নাকি?

ঝাঁঝিয়ে উঠল কল্যাণী: আমার না তোমার? সেই খোকার অন্নপ্রাশনের দিন কিনেছিলে মনে নেই? বলেছিলে, কোথাও যেতে আসতে একটা জামা নেই, তাই একটা নিয়ে এলাম—

কথাগুলো যেন কিছুতেই এখন মনে পড়ে না উমানাথের। না পড়াই ভাল! নিজের অক্ষমতা যতটা ভোলা যায় ততই ভাল! কবে জামাটা কেনা হয়েছে সে গবেষণার চেয়ে একটা জামার প্রয়োজন আরো বেশী।

আরো কিছুক্ষণ পরে, মুখখানা কাঁচুমাচু করে চাইল উমানাথ কল্যাণীর দিকে। খানিকটা সহানুভূতির আশায়: আমার আর কোন জামা নেই, বাক্সে তোমার কাছে পুরনো আমলের কোন একটা?

—হ্যাঁ আছে, হাজার গণ্ডা জামা আনছ মাসে মাসে। ঝাঁঝিয়ে ওঠে কল্যাণী: আজ ক'বছর ধরে একটার বেশী দু'টো জামাতো কিনতে দেখিনা বাবুকে—

—আহা—হা চট কেন, আমি কি সে কথা বলছি নাকি? জিগ্যেস করছি এতে চটার কি আছে? একেবারে আস্ত না থাক্

একটু আধটু ছেঁড়া খোঁড়া থাকতেও পারে পুরনো আমলের বাতিল হওয়া—দেখনা একবার বাক্স প্যাটরা খুঁজে ?

তক্তোপোষের ওপর ছুঁড়ে দেয় চাবির রিংটা কল্যাণী : বিশ্বাস না হয় নিজেই একবার খুঁজে দেখনা—

চাবি নিয়ে উঠবার সাহস বা ইচ্ছা হল না উমানাথের। কি হবে শুধু শুধু তক্তোপোষের তলা থেকে ভাঙা বাক্সগুলো বার করে ? চাবিটা শুধু শুধুই ছুঁড়ে দিয়েছে কল্যাণী, হয়ত বা একটু ব্যঙ্গ করেছে নির্মমভাবে উমানাথের প্রাচুর্যহীনতাকে। মনে পড়েছে উমানাথের একটা তোরঙ্গেও চাবি লাগে না, সেই এককালে—অনেকদিন আগে ব্যবহার হত ওগুলো। সস্তার দিনে থাকত জোড়ায় জোড়ায় জামা কাপড়, থাকত শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গার ধুতি শাড়ী। বাইরে বেরুবার জন্য থাকত আদ্দির পাঞ্জাবী, সিল্কের টুকরো দেখা যেত না খুঁজতেই। পায়ের জুতোর মত চামড়া না ফাটতেই, রং না ফিকে হতেই যেত পাল্‌টে, তালি বা সেলাই হবার আগেই। এবার গিয়ে জমত ভাঙ্গা পুরনো প্যাটরা বা তোরঙ্গে। তারপর গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দেওয়া—

এবার কঠিন দৃষ্টিতে তাকায় উমানাথ, কল্যাণীর দিকে : আমার সেই সিল্কের জামাটা কোথায় গেল ? বার কর শিগ্‌গির—

—কোন সিল্কের জামা, কবেকার ? যুদ্ধের পর থেকে কবে আবার সিল্কের জামা কিনেছ শুনি ? অবাক আর বিরক্ত হল কল্যাণী।

তার বিরক্তি গায়েই মাখল না উমানাথ একটুও : তা আমি জানি এ বাজারে কত শালাই সিল্কের জামা পরে আমার জানা আছে। সূতি জোটে না ত আবার সিল্ক ?

নীরস কণ্ঠে বলল কল্যাণী : নিজের ক্ষমতায় কুলোয় না তাই বল, অন্যের কথা বল কেন ?

হঠাৎ যেন কিছু বলতে পারে না উমানাথ। একটা চড় যেন

সশব্দে এসে পড়েছে উমানাথের গালে। একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়তে চায় উমানাথ। ইচ্ছে করে কল্যাণীর সাদা ফ্যাকাশে গালটার ওপরে একটা আচমকা চড় বসিয়ে দেয় কিম্বা চুলের মুঠি ধরে অথবা পোয়াতি পেটটার ওপর একটা লাথি কসায় বেশ জুতসই করে—কিন্তু এককালে কবিতা ভালবাসত উমানাথ। ভালবাসত সাহিত্য, পড়েছে সেক্সপিয়ার, মিল্টন, দান্তে, গ্যাটে, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, তাই দাঁতে দাঁত চেপে বলল: দেখাও তোমার আত্মীয় স্বজন কটা লোক আজ সিল্কের জামা পরে? ছেঁড়া জামা অনেকেই চাদরের তলায় পরে আসে লুকিয়ে। কেউ বা রিফু করে।

—আমার দাদারা না হয় গরীব, সে খোঁটা আমায় কি না দিলে তোমার গৌরব বাড়ে না? কেমন যেন বিবর্ণ, ফ্যাকাশে, ভাঙা ভাঙা গলার স্বর। বোধহয় কোন একদিন এসেছিল কল্যাণীর বাপের বাড়ী থেকে—কোন ভাইটাই এসেছিল কোন্ গোপন ছেঁড়া সেলাই এর দাগ লুকিয়ে চাদরের আড়ালে—

কিন্তু সে কথা বলতে চায়নি উমানাথ। এ শুধু কথার কথা। আজকে দেশের পনেরো আনা লোকের অবস্থা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে কটা কথায়। সে কথা বলে খোঁটা দেবে কেন উমানাথ? সে জানে আজকের দিনের মানুষের অবস্থা, কি করে যে খেয়ে পরে বেঁচে আছে আজকেও? কি করে রোগা শরীর নড়বড়ে ঘাড় নিয়ে টিকে আছে এখনো?

কাঁথার ওপর সেলাইয়ের ফোঁড় দিতে দিতে হঠাৎ যেন উজ্জল হয়ে ওঠে কল্যাণীর মুখ। একটা জুতসই জবাব হাতের কাছে খুঁজে পায়। কল্যাণীর আত্মীয় স্বজন সকলেই ছেঁড়া জামা চাদরের আড়ালে লুকিয়ে পরে আসে না সাবধানে, কেউ কেউ সিল্ক, সার্টিনও পরে। কাঁথা থেকে চোখ তুলে প্রশ্ন করে কল্যাণী: আচ্ছা বোকা মামার কথা

মনে আছে সেই যে—একটু থামল, উত্তেজনায় হাত কাঁপছে কল্যাণীর। কোঁড়গুলো পড়ছে না ঠিক মত। আঁকা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে যেন। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নেয় কল্যাণী। মুখ না তুলেও বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে এক জোড়া চোখ রাগে, বিস্ময়ে চেয়ে আছে তার দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে। তবুও বলে, একটু কঠিন করে বলতে চেষ্টা করে হয়ত একটু শ্লেষ থাকে কথার শেষে, তীক্ষ্ণ শরের মত একটা হিংস্র ভাব: যার কাছে, মনে নেই আমাদের বিয়ের পরেই গেছলে যার ব্যাঙ্কে চাকরীর জন্য, সেই বোকা মামার কথা বলছি গো। অকারণে যেন হাসিতে ভেঙ্গে পড়তে চায়। একটু চাপা উল্লাসের ভাবও ফুটে ওঠে ঠোঁটের কোণায় কোণায়। হ্যাঁ, এতক্ষণে ঠিক সমান সমান উত্তর দিতে পেরেছে কল্যাণী, উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে পেরেছে: তাকে কোনদিন আমরা সুতির জামা পরতে দেখিনি। তার ওপর দিনে তিনবার করে জামা ছাড়া চাই। সেই ছোটবেলা থেকে দেখছি একই রকম। কোন পরিবর্তন হয়নি এত বছর পরেও। এবার একবার মুখ তুলে তাকাতে ইচ্ছে করে, দেখতে ইচ্ছে করে চড় খাওয়া বোবা মুখটা উমানাথের কতটা নিষ্প্রভ আর ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে এক মুহূর্তে।

—তোমার সে মামা—তক্তোপোষ থেকে নিচে নেমে দাঁড়িয়েছে উমানাথ।

এটা যেন বুঝতে পারল কল্যাণী, কিন্তু বুঝতে পারল না কেন এত অপমানের পরেও একটু কাঁপছে না উমানাথের গলার স্বর, কেন জড়িয়ে আসছে না আত্মগ্লানিতে?

—তোমার সে মামার সঙ্গে দেখা হলে জিগ্যেস করো হাজতে সাতদিন কি তিনি সরকারী সিল্কের জামা পরেছিলেন না বাড়ী থেকেই দিয়ে গেছল অসুবিধে হবে বলে?

অনেকদিনের অভ্যাস মত কল্যাণীর নীল হয়ে যায় সারা মুখ। সাপের ছোবলের মতো তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ কান থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক চেষ্টা করেও মুখ তুলতে পারে না, পারে না উমানাথের মুখোমুখি তাকাতে। এতক্ষণে বুঝতে পারে কল্যাণী, কেন কাঁপেনি উমানাথের গলা কেন বুজে আসেনি। কি করে জানবে কল্যাণী, কবে তার বোকা মামা ব্যাঙ্কের টাকা ভেঙ্গে হাজতে গেছে, উমানাথও কই বলেনি ত তাকে এতদিন। ঝল্‌মল্‌ করে ওঠে কল্যাণীর চোখের জল ফোঁটায় ফোঁটায়। ষাট পাওয়ারের বাল্বের আলোয়ও কাঁথায় ছুঁচের ফোঁড় আর পড়ে না। উঠে আসে কল্যাণী রান্নাঘরে। কে তার বোকা মামা? তার কেউ নয়, কেউ নয়। কেটলির ফুটন্ত জলের দিকে তাকিয়ে চায়ের কৌটো নামায় সেল্‌ফ থেকে। কেটলিতে চা ভিজোতে দিয়ে কাপ ডিস গুছিয়ে আনে কাছে। মনে পড়ে সেই সকালবেলা ছুটো, নাকে মুখে গুঁজে গেছে লোকটা—

রাত্রে রান্নাঘরের ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে রোজকার চেয়ে একটু আগেই ফিরল কল্যাণী। তখনো ঘুমোয়নি উমানাথ। রোজকার মত একটা পান এগিয়ে দিল উমানাথের দিকে। হাত বাড়িয়ে পানটা ধরল না উমানাথ, কল্যাণীর পান শুদ্ধু হাতটা ধরে টেনে কাছে আনল। কল্যাণী কেঁদে বলল: বোকা মামা আমাদের কেউ নয়, মিথ্যা কথা বলেছি তোমায়। টল্‌টলে জল ঝল্‌মল্‌ করে উঠল কল্যাণীর দু'চোখে।

গভীর স্বরে এবার বলল উমানাথ: ওরা আমাদের কেউ নয় কল্যাণী, রক্তের সম্বন্ধ ত দূরের কথা আত্মীয়তা পর্যন্ত থাকতে নেই, পাপ হয়!

আর কোন কথা বলল না কল্যাণী। বলতেও পারল না।

সকালবেলা অফিসে যাবার সময় অবাক হল উমানাথ। কখন যেন ছেঁড়া জামাটাই ভারী আশ্চর্য সুন্দর সেলাই করে রেখেছে। ধুয়ে কেচে পরিষ্কার করে রেখেছে কল্যাণী। ভারী ভালো লাগল উমানাথের, ভারী মমতা হল জামাটার ওপর। উলঙ্গ দারিদ্র প্রকাশের চেয়েও একটা অপূর্ব সূক্ষ্মশিল্পকুশলতা মেখে রয়েছে সেলাইয়ের ফোঁড়ের সঙ্গে সঙ্গে।

কল্যাণী দাঁড়িয়ে ছিল কাছে, পাশেই। হাসি মুখে তাকাল উমানাথ। তাকাল কল্যাণীর মায়াময় চোখের দিকে, মাতৃত্বের স্নিগ্ধ জ্যোতির দিকে। ভালো লাগল ভারী জিগ্যেস করল: কেমন আছ আজ?

কল্যাণীর প্রতি লোমকূপ এখন স্নেহাতুরা। মাথা নাড়ল কল্যাণী, বলল: ভাল আছি। এবার একটা হাত ধরল কল্যাণী উমানাথের। তাকাল চোখের দিকে। পুরুষ উমানাথের দিকে। একমুহূর্তের জন্য মাথা রাখল তার কাঁধে, বুকে। তারপর সরে দাঁড়াল আবার। হাত ছাড়ল একটু পরে।

হাসল উমানাথ, বলল: তোমার মাকে একটা খবর দিতে হয় কি বল? এবার না হয় একটু আগেই আসবেন মেয়ের বাড়ীতে। তোমার ত কষ্ট হচ্ছে কাজকর্ম করতে? তাকায় উমানাথ কল্যাণীর দিকে।

—সে হবে এখন। সময় হলে আমি বলব। তার আগে আমার একটা কথা রাখবে বল?

—আরে বল না—কালকের কথা ভোলনি বুঝি এখনো? আমায় ক্ষমা করো কল্যাণী। আমার মাথার ঠিক ছিল না।

কল্যাণী মুখে হাত দেয় উমানাথের: ধ্যাৎ তা নয়, বিকেল বেলা একটু তাড়াতাড়ি ফিরো তোমার জামা কিনতে যাব।

বাধা দিতে চায় উমানাথ: তুমি কি হাঁটাহাঁটি করতে পারবে এই শরীর নিয়ে? শেষকালে একটা কিছু বাধিয়ে বসো আর কি।

—না কিছু হবে না, তুমি দেখো—আদুরে মেয়ের মত আবদার করতে থাকে কল্যাণী। ঘাড় বাঁকা করে।

—আচ্ছা, আচ্ছা সে দেখা যাবে। কিন্তু—একটু ভেবে মুখ কাঁচু মাচু করে বলে উমানাথ: টাকা—এখন হাতে টাকা নেই আমার। আর কটাদিন বাদে মাসকাবারে কিনলেই হবে এখন কি বল? তুমি যা সেলাই করেছ, একদিনে আর কিছু হবে না। উৎসাহিত হয়ে ওঠে উমানাথ—যেন একটা উপায় বাতলে দিয়েছে।

কিন্তু নাছোড় কল্যাণী: না সে হবে না—আজকেই চাই, বিকেলেই যেতে হবে।

—কিন্তু টাকা? আবার সেই টাকার প্রশ্ন আসে ঘুরে ফিরে।, শেষকালে উমানাথ বলে: টাকার জোগাড় হলে আজকেই তা না হলে দু' এক দিনের মধ্যে টাকার জোগাড় যেদিন হবে, শরীর ভালো থাকলে সেদিনই তোমায় সঙ্গে নিয়ে কিনে আনব।

—আমি যদি টাকা দিই—বলে কল্যাণী। উমানাথ তাকাতেই আবার বলল: কি বিশ্বাস হচ্ছে না, আচ্ছা বেশ এখুনিই এনে দিচ্ছি বলে একটু পরেই একটা সিগারেটের কৌটো নিয়ে এল। তারপর বলল: মুখটা কাটো দেখি—

মুখ কেটে উপুড় করে ধরতেই বেরলো একগাদা আনি, দুয়ানি, আধআনি আর আগেকার পুরনো আর ছ্যাঁদা পয়সা।

—আরে বাপস্ করেছ কি, কত যুগ লাগাল তোমার এই ধনভাণ্ডার সঞ্চয় করতে?

কথা কইলনা কল্যাণী, গভীর উজ্জ্বল চোখে একবার তাকাল উমানাথের দিকে, তারপর সাজিয়ে সাজিয়ে গুণতে লাগল নিঃশব্দে।

উমানাথ বলল: তোমার এ ধনভাণ্ডারের এ্যাকাউণ্ট মেলাতে গেলে আজ আর অফিসে এ্যাটেনডেন্সের খাতায় দাগ পড়বে না। অতএব আমি চলি, তুমি গুণে রেখো। বিকেলে এসে যা হয় ঠিক করা যাবে।

কিন্তু বিকেল বেলা একবার বেরুতে হল বটে উমানাথের তবে কল্যাণীকে ছাড়াই আর জামা কিনতে নয়, কল্যাণীর ওষুধ কিনতে। অফিস থেকে ফিরতেই অবাক হয়ে গেল উমানাথ। চুপচাপ শুয়ে আছে কল্যাণী। ক্লান্ত, পাণ্ডুর মুখ, নির্জীব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। জিগ্যেস করতেই বলল: শরীরটা ভালো লাগছে না, তাই শুয়ে আছি। তারপর উমানাথের মুখের দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে বললেন: না না তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না, আমার কিছু হয়নি গো, এখুনি ভাল হয়ে যাব। একটু পাশে বসো, আমার কাছে—

পাশে বসা তো দূরের কথা, কথা শোনার মতো অবসর বা মনের ধৈর্য ছিল না উমানাথের তখুনি ছুটে বেরিয়ে গেছলো বাইরে।

ডাক্তার অবশ্য দেখে শুনে বললেন: না, ভয় করার কিছু নেই। হঠাৎ একটু হার্ডলেবার করায় একটু আনইজি ফিল করছেন। আপনারা একটুও যদি না বোঝেন যে এসময়ে একটু সাবধানে থাকা উচিৎ।

উমানাথ বলল: শোন কল্যাণী, শোন এ আমার কথা নয় যে তুমি না শুনে পারবে।

খস্‌খস্‌ করে প্রেসক্রপসন লিখে চলেন ডাক্তার।

প্রেসক্রপসনে লেখা আছে, একটা মিকশ্চার আর একটা টনিক। ডাক্তারবাবু বলেন: দেখুন টনিকটা বিলেতী যদি পান ত ভাল হয় না হলে অন্য একটা লিখে দেব এখন পরে।

—আর ডায়েট? জিগ্যেস করে উমানাথ।

—সাবষ্টেন্‌সিয়াল ফুড চাই। সকালে ডিম দিতে পারেন হাফ-

বয়েল করে তারপর ফ্রুট জুস্, হরলিকস্। বাইরে ফিসের টাকা নেবার সময় একেবারে অন্য সুর ডাক্তারের: পেসেণ্টের হার্ট উইক, ব্লাড প্রেসারও নর্মাল নয়। ইউ শুড ডিল উইথ দি পেসেণ্ট ভেরী কেয়ারফুলি। মাইণ্ড ইট্, আদারওয়াইজ—সিগারেটে আগুন ধরালেন ডাক্তার।

জামা আর কেনা হল না। তারপর ছুটতে হল প্রেসক্রপসন নিয়ে। কল্যাণীর জমানো ১১।৵১০ আনায় কুলোল না। উমানাথের ধার করে আনা ১৫৲ টাকারও প্রায় সব খরচ হয়ে গেল।

সব কেনা হল টনিকের এক ফাইল পেলেই হয়। কিন্তু কোথায়? প্রেসক্রপসন দেখাতে দেখাতে বিরক্তি লাগে, নাম বলতে বলতে মুখে ফেনা জমে যায় আর পায়ের মাস্‌লগুলো টন্‌টন্ করে ওঠে হাঁটতে হাঁটতে। এক জায়গায় জিগ্যেস করে উমানাথ টনিকটার নাম বলে: আছে টনিকটা ও দাদা শুনছেন, এই টনিকটা আছে?

তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে লোকটা বলে: না নেই ফুরিয়ে গেছে।

—কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন? ঘুরে ঘুরে পায়ের ত আর কিছু নেই।

—কি করে বলব কোথায় পাওয়া যাবে, আমাদের নেই তাই বললাম।

এরকমই আর এক জায়গা থেকে না পেয়ে বেরিয়ে আসছিল উমানাথ, একজন লোক কাউণ্টার থেকে বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে, বলল: ও মশাই শুনুন—

ফিরে তাকিয়ে উমানাথ থমকে দাঁড়াল।

কাছে এল লোকটা, চাপা গলায় বলল: টনিকটা আপনার খুব দরকার?

—হ্যাঁ। ম্লানমুখে বললে উমানাথ: আমার স্ত্রীর অসুখ তার জন্য—

—তবে ত ভীষণ বিপদে পড়েছেন আপনি—চুকচুক্ করে জিভ তালুতে লাগিয়ে আপশোষসূচক শব্দ করল: ও ত আপনি পাবেন না আর এখন চালানও আসে না। ফরেন গুডস্ কিনা, তবে—

চিন্তিত মুখে তাকায় উমানাথ: আমি কি করব? ব্যাকুল হয়ে বলল।

—আচ্ছা আপনাকে জোগাড় করে দেব ওটা কিছু ভাববেন না। আমার চেনা একজনের কাছে ওল্ড ষ্টক ছিল আগেকার, পাওয়া যেতে পারে, তবে একটু দাম বেশী নেবে তা সামান্যই—

—কত বেশী নেবে? জিগ্যেস করে উমানাথ।

—কত আর—বলল লোকটা: অরজিনাল থেকে ২।৪ টাকা আর কি। তাহলেও আপনার নেওয়া উচিৎ। ভারী সুন্দর ওয়ার্ক দেয়, আমরা দেখেছি ত—

—কত দাম ওটার? জিগ্যেস করে উমানাথ।

—সাড়ে ন'টাকা। অরিজিনাল টাকা চারেকের মধ্যে।

—এত তফাৎ, চার টাকা আর সাড়ে ন'টাকা? কেঁপে ওঠে উমানাথ।

—এতেই, আরে যুদ্ধের সময় আমি ৩৫৲ টাকা পর্যন্ত বেচেছি। যার দরকার আছে নিয়েছে, নেবেও। আর আপনি এতেই মুসড়ে পড়ছেন। আজকের কাগজ দেখেছেন? ভাবনা কি, আবার ৩৫৲ টাকায় বিক্রী করব। যুদ্ধ তো লাগল বলে। দেখছেন না পলিটিকেল সিচুয়েশন? কোরিয়ায় আমেরিকান ট্রুপ্‌ পিছু হটছে আর এ্যাটম বোমা ফেলব বলে চ্যাঁচাচ্ছে। দু'চারটে কিনে রাখুন এসময়ে পরে আর পাওয়া যাবে না।

চমকে উঠল উমানাথ। আবার যুদ্ধ? আবার চালের দর উঠবে আশিতে, আগুন হবে জামা কাপড়। পাওয়া যাবে না ওষুধ—কল্যাণীর জন্য টনিক। ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের কাছে হয়ত পাওয়া যাবে যার দাম হবে ৪০৲ টাকা। আবার লোক মরবে না খেয়ে—

দশটাকার নোট একটা বার করে দিল উমানাথ, না এক ফাইল নেবে সে। যুদ্ধ—না আর যুদ্ধ চায় না উমানাথ। জানে যুদ্ধ বাঁধলে বড় হবার মাথা তুলবার সুযোগ আছে। সুবিধে আছে লক্ষ্মীর আঁচলে গিঁট বাঁধবার। তবুও যুদ্ধ চায় না উমানাথ। যদিও এখানে এখনও অশান্তি আছে, আছে হাহাকার, আছে শোষকের শোষণ, আছে ক্ষমতালোভীদের জন-সাধারণের প্রতি নির্লিপ্ততা, যদিও চার টাকার টনিক বিক্রী হয় সাড়ে ন'টাকায় তবুও যুদ্ধ চায় না উমানাথ। চায় না লোভীদের জন্য অকারণ রক্তস্রোত। নিজের জন্য শুধু নয়, কল্যাণীর নীরোগ দীর্ঘায়ু আর আগত মানবকটির জন্য উমানাথ যুদ্ধ চায় না।

[illegible]

অবশ্য অমিয়কান্তি ভেবেছিল চমকে উঠবে সুলতা হঠাৎ সেলাই কলটা দেখে। সেই জন্যেই আগে থেকে কাউকে কিছু জানায়নি সে। ইচ্ছে ছিল হঠাৎ বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে চমকে দেবে সকলকে, বিশেষ করে সুলতাকে—

কাগজের মোড়কটা ওপর থেকে দেখে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি সুলতা। ছুটে এসে খুলতে গেছল কাগজের মোড়কটা কিন্তু—

হাত দিয়ে তাকে ধরে ফেলেছিল অমিয়কান্তি: উহুঁ আগে বলত কি আছে এতে?

ঠোঁট ফুলিয়ে বলল সুলতা: বারে, আমি কি করে বলব? আমি ত আর আনিনি—

হেসে বলল অমিয়কান্তি: তা ত আমি জানি, সেই জন্যেই জিগ্যেস করছি—

—না আমি জানি না খোলো—আদুরে মেয়ের মত ঘন হয়ে এল

সুলতা: খোলো, আহা খোলোইনা বাপু—বলে তার অপেক্ষা না করে নিজেই খুলতে লেগে গেল।

স্ত্রীর দিকে হাসি মুখে চেয়ে রইল অমিয়কান্তি। প্যাকিংটা খোলা হল। ভেবেছিল আনন্দে খুসীতে উচ্ছল হয়ে উঠবে সুলতা।

কিন্তু ঠোঁট উলটে বলল সুলতা: ও এই—আমি ভেবেছিলাম না জানি কি—বলে উঠে দাঁড়াল।

আহত হল অমিয়কান্তি সুলতার এই নিস্পৃহতায়। শুধু বলল: পছন্দ হয়নি বুঝি? তুমি কি ভেবেছিলে বলত?

তেমনি সুরে আবার বলল সুলতা: ভেবেছিলাম রেডিও টেডিও, আজকাল ত সকলের বাড়ীতেই থাকে। তা ছাড়া আমি ত তোমাকে বলেছিলাম কতদিন, তোমার কি সেসব কথা আর মনে আছে?

হঠাৎ কোন কথা বলতে পারল না অমিয়কান্তি। নিশ্বাস ফেলে বলল: মনে আছে, সুলু ভুলিনি। থাক তবে তোমার যখন পছন্দ নয়—বলে নিজেই আবার কাগজে মুড়ে রাখতে লাগল।

অমিয়কান্তির দিকে না তাকিয়েই বলল সুলতা: হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ও ফেরৎই নিয়ে যাও। শুধু শুধু কতগুলো টাকা নষ্ট আর কি—

কোন কথার উত্তর দিল না অমিয়কান্তি। নিঃশব্দে কাজ করতে লাগল। তারপর একসময়ে বলল: ভেবেছিলাম তুমি ত একটু আধটু সেলাই করতে পারবে তাই—

—না বাবা সে আমি পারব না? একে আমার চোখের অসুখ তা ত তুমি জানোই। তার ওপর তোমার সেলাই করতে গেলে, চোখের কি আর কিছু থাকবে?

স্ত্রীর দিকে একবার বিষণ্ণ-দৃষ্টিতে তাকাল, পরে নিরীহ গলায় বলল অমিয়কান্তি: তবে থাক—

টেবিলের ওপর তুলে রাখছিল সেলাইয়ের কলটা, আহ্নিক সেরে শৈলবালা এলেন, বলেন : কি এনেছিস রে ?

হেসে বলল অমিয়কান্তি : কই কিছু না ত—

বিস্মিত হয়ে শৈলবালা বললেন : সে কিরে—আমি যে ঠাকুর ঘর থেকে সব শুনলাম—

কপট গাম্ভীর্যে বলল অমিয়কান্তি : সে কি মা, তুমি ত জপ করছিলে কিন্তু শুনলে কি করে ?

সস্নেহে বললেন শৈলবালা : তোদের জ্বালায় কি আর তার জো আছে, পরকালের ভাবনা তোরাই ভুলিয়েছিস যে—

ভারী অদ্ভুত লাগল কথাগুলো ওদের। একে চাপা মানুষ শৈলবালা। চট করে বেশী কথা বলেন না। তার ওপর সর্বক্ষণ কাজ-কর্মে ব্যস্ত। রান্নার জোগাড় দেওয়া, বাজারে লোক পাঠানো—অমিয়কান্তি রোজ রোজ যেতে পারে না, যেতে চায়ও না। নীচের ফ্ল্যাটের বিশুকে দু'চার আনা পয়সা ঘুষ দিয়ে বশ করে তবেই না—

দুপুর বেলা রামায়ণটা খুলে বসেছেন শৈলবালা। খাওয়ার পরে অলস তন্দ্রায় স্নায়ু শিথিল। জানালা দিয়ে এসে পড়েছে খানিকটা হলদে রোদ। ছায়া পড়েছে জানালার ওপর লুটিয়ে পরা জামরুল গাছটার, নীলচে ভারী ভারী ডাগর পাতার—

বারান্দায় কুণ্ঠিত পায়ের শব্দ শোনা যায়। চশমাটা খুলে আঁচল দিয়ে মুছে চোখে তোলেন আবার আলস্যের হাঁই তুলতে তুলতে। পায়ের শব্দ এসে দাঁড়ায় দোরগোড়ায়। প্রতীক্ষা করেন শৈলবালা কিছুক্ষণ, চুপচাপ, নিঃশব্দে—পরে নিজেই ডাকেন : কে বিশু নাকি ? এস ভাই ভেতরে এস—

ঘরে ঢুকে একটা নিঃশব্দ সরল হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলে বিশু

বলে: আপনি এখনো ঘুমোননি ঠাকুমা, বলতে বলতে কাছে, পায়ের কাছে এসে বসে—

—কি আর করব ভাই, বইটা নিয়ে বসেছিলাম একটু। তন্দ্রা এসেছে তাই আর কি—তোমার খবর কি, দুপুরে শোওনি যে আজ?

—না। ভাল লাগল না ঠাকুমা, তাই পালিয়ে এলাম। আজ তোমার কাছে শোব কেমন?

—আচ্ছা হবে এখন—আমাকে একটু পড়তে দে দেখি, বলে রামায়ণ খানা টেনে নিলেন চোখের সামনে। গুন্ গুন্ সুরে পড়তে সুরু করলেন। সীতার পাতাল প্রবেশ। পড়তে পড়তে আবেশের ঘোরে চোখের কোণায় জল জমে উঠেছিল কখন। রাজনন্দিনী সীতার দুঃখের করুণ অধ্যায় বিচলিত করে তোলে আজও শৈলবালাকে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ফিরে দেখেন বিশু অন্যমনস্ক হয়ে জানালার দিকে চেয়ে। দূরে আকাশে কটা চিল চক্রাকারে উড়ে বেড়াচ্ছে। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন শৈলবালা। মনে হয় আগের থেকে অনেক যেন রোগা হয়ে গেছে বিশু। ঘাড়ের দাঁড়া দু'টো অনেক সরু আর রোগাটে দেখাচ্ছে যেন—হয়ত কোনদিন মাথাটার ভার আর যেন সইতে না পেরে মট্ করে ভেঙে পড়বে। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থেকে থেকে বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল শৈলবালার। কান্নার মতন কি যেন একটা ঠেলে ঠেলে আসতে চাইল বুকের কাছটায়। ডাকলেন শৈলবালা: হ্যাঁরে, বিশু এদিকে শোন ত কাছে আয়—

—কি ঠাকুমা? ধ্যান ভেঙে জেগে উঠল বিশু। তারপর শৈল-বালার কোল ঘেঁসে দাঁড়াল।

—আজকে কি দিয়ে ভাত খেয়েছিস রে ?

—ডাল দিয়ে, মাছ দিয়ে, বলল বিশু। তারপর একটু থেমে আবার জিগ্যেস করল : হ্যাঁ ঠাকুমা তুমি কি দিয়ে খেয়েছ ?

—কেন রে ? খাবি নাকি, অনেকখানি মোচার ঘণ্ট আর ডালনা আছে।

—এখন না, পরে কেমন ? জান ঠাকুমা বাবার সঙ্গে সকালবেলা একটা লোকের কত ঝগড়া হয়েছে।

—কই শুনিনি ত, কেন রে ?

—আচ্ছা কাউকে বলবে না বল, কাউকে কোনদিন নয় ?

—নারে না, বলব না।

—লোকটা বাবাকে চোর বলেছে। ছোট খুকুর জামার কাপড় নাকি তার—কেন চোর বলেছে ঠাকুমা, ওইটুকু কাপড় নিলে চোর হয় নাকি ? তারপর থেমে একটু পরে বলল : জান মা কেঁদেছে কত। কারো সঙ্গে কথা কয়নি। রান্নাও করেনি আজ—

শিউরে উঠলেন শৈলবালা, সারাটাদিন এই কচি শিশুরা না খেয়ে আছে। ধন্য ঝগড়া বাবা! এবার বললেন শৈলবালা : তবে যে বললি খেয়েছিস বিশু ?

—সে ত মা বললে—কেউ জিগ্যেস করলে বলবি ভাত খেয়েছি মার কথা শুনতে হয় না ঠাকুমা ?

সস্নেহে এবার বললেন শৈলবালা : তা ত বটেই! যা বিশু তোর দাদা আর ছোট খুকুকে ডেকে আনগে যা। তারপর একসঙ্গে বসে খা।

—দাদা ত বাড়ী নেই, ইজের বেচতে বেরিয়েছে সেই কোন সকালে।

শৈলবালার চোখের সামনে কেবলি ভেসে বেড়াতে লাগল একটি রৌদ্র দগ্ধ তাম্রাভ কিশোরের ক্ষুধার্ত মুখ।

বিশু এবার তাড়া দিল : তবে কি হবে খালি খুকুকে ডাকব না একাই বসে যাব।

বিশু, শিশুদের বাবার কথা মনে পড়ল শৈলবালার। নিরীহ গোছের চেহারা, ক্লান্ত, খোঁচা খোঁচা একগাল দাড়ি, নির্বোধ চাউনি। মা-বাবা ত জেগে ছেলেদের জামা-ইজের কাটে, সেলাই করে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে, আর তারই বিক্রীর চেষ্টা চলে সারাটাদিন।

বাড়ীর টুকিটাকি সেলাই ফোঁড়াইর জন্য লোকটা অনেকবার এসে বলে গেছে শৈলবালা, অমিয়কান্তি এমনকি সুলতাকেও।

—দেবেন স্যার আমাকে সেলাই ফোঁড়াইএর কাজগুলো। বাইরে থেকে ত করান, এবার থেকে আমাকেই খবর দেবেন।

অমিয়কান্তি অবশ্য গররাজী হয়নি। ভাল কথাই, সুবিধে কত্ত, কাটিং উনিশ বিশ হয়ত হবে এবং দামটাও নিশ্চয়ই কম হবে চার ছ' আনা। তাই বা কম কি এই মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে?

সুলতা অবশ্য হেসেই অস্থির : তবেই হয়েছে, মাগো! আর লোক পেলে না—তোমার সার্ট শেষকালে ফতুয়ায় না গিয়ে দাঁড়ায়?

—চেহারাটা সবসময় বড নয় সুলু, কার মধ্যে কি আছে কে জানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, চেহারাটাই সব। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় কে কোন কাজের উপযুক্ত।

—বাইরের চেহারা দেখে লোকের বিচার করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়, তাছাড়া লোকটার কি এমন একটা দেখলে যে তুমি বুঝে গেলে ওর জামার কাটিং ফতুয়ার মত হবে। অভাবের চেহারা বলে এই রকম তা না হলে দাড়ি কামিয়ে পরিষ্কার জামা জুতো পড়লেই আবার দেখবে অন্য মানুষ!

—ও আমরা পারি গো, ওটুকু না বুঝলে আমরা যে মিথ্যে হয়ে

যাই। মেয়ে হয়ে জন্মেছি—মনে নেই তুমি যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে আমি কি বুঝিনি আসলে—

কৃত্রিম কোপে অমিয়কান্তি বলল : ও এই—তুমি যে আগুন রোদে মানুষ ঘরের বাইরে বেরুতে পারে না, ছাদে এসে চুল শুকোতে সেকি আর আমি বুঝতাম না ভেবেছ? কলেজের সকলকে ডেকে এনে দেখাতাম বেহায়া মেয়ের কাণ্ডটা!

—যা সত্যি?

অতীতের স্মৃতি রোমন্থনের আবেশে মেদুর দৃষ্টি নিয়ে স্বামীর কাছে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে বসল স্নলতা। বলল : আচ্ছা মাকে বলেছিলে, মা জানতেন সব?

—সব না হোক অনেকটাই জানতেন, বাকীটা দেখতেন—বলল অমিয়কান্তি।

—তুমি বলেছিলে, বলতে পারলে?

—সব কি আর বলতে হত—একমাত্র ছেলের চুলে তেল নেই, নাওয়া-খাওয়া ঠিক নেই, উদাস উদাস ভাব—তার ওপর ঘর থেকে নড়বার নাম গন্ধ নেই, সকাল বিকেল বেড়ান বন্ধ এমনকি কলেজ কামাই সুরু হল শরীর খারাপ অজুহাতে—

—বাঃ বাঃ এত সমস্ত করেছিলে? আর এতদিন সাধু সাজা হয়েছিল? মাকে আমার এত ভাল লাগে নিজের মায়ের মত—

—আর মায়ের ছেলেকে কার মত? পাঁচু গয়লার মত?

—যা ছোটলোক কোথাকার, মুখের লাগাম নেই—

—লাগামে কি আর মুখ বন্ধ হয় তার জন্ম অন্য ব্যবস্থা আছে, বলত আমি মুখ বন্ধ করতে রাজী আছি।

—না অত সস্তা নয়। আমি মায়ের কাছে যাই, রামায়ণ শুনিগে বাবা এখানে কি আর রক্ষা আছে।

মাঝে মাঝে শৈলবালাও বলেছেন: দাওনা মা তোমার ঘরোয়া জামাগুলো একতলার ওই বিশুর বাপকে। অন্যকে দিয়েও করাচ্ছ ওকে দিয়েও করিয়ে দেখনা কয়েকটা পারে কিনা?

সুলতা বললে: আপনাকেও বলেছে বুঝি মা? আচ্ছা লোক ত—এই ত সেদিন আপনার ছেলেকে বলে গেছে একবার। তারপর নীচের বৌটা কালকে আমায় একবার বলেছে, আজকে আবার আপনাকে—

—না না আমাকে কিছু বলেনি। নীচে যাবার সময় দেখা হল বৌটার সঙ্গে, দেখে ভারী মায়া হল—অমন রোগা বৌটা তারপর পেটে একটা নিয়ে পা-কল চালাচ্ছে দেখলাম। একটা না কেলেঙ্কারী করে বসে।

—আসলে আপনাকে ভাল মানুষ পেয়ে একটু মন ভিজিয়েছে। ওসব ন্যাকামী—ছোটলোকদের কি আর সে জ্ঞানগম্যি আছে, টাকাটাই বড় ওদের কাছে—

মনে পড়ল সুলতার ও সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নাবার সময় কতবার দেখেছে প্রায়ান্ধকার ঘরে অল্প পাওয়ারের আলোর নীচে ক'টি প্রাণী। একটি পুরুষ ও একটি নারী আর তাদের সন্তান-সন্ততি। মেঝেতে দু' এক থান কাপড-চোপড় ছড়ানো, কাটা। নিয়ম মাফিক। তার সঙ্গে মেঝেতে ক'টা শিশু আর আলোর নীচে সেলাইয়ের কলের সামনে এক জোড়া মানুষ। মুমূর্ষু, ক্লান্ত, জীবন-যুদ্ধে পর্যুদস্ত। একজন কাটে আর একজন ঝুঁকে পড়ে কল চালায়, সেলাই করে।

এরমধ্যে বৌটার সঙ্গে দু'একটা কথা হয়েছে সুলতার। অমিয়কান্তির সঙ্গে হয়ত বেরুচ্ছে বেড়াতে, কার্জন পার্ক বা সিনেমায়। ঘরের দরজায় হেলান দিয়ে নির্জীবের মত দাঁড়িয়ে শ্বাস টানছে বৌটা। ফ্যাকাসে ক্লান্ত চোখে চেয়ে জিগ্যেস করেছে: বেড়াতে যাচ্ছেন বুঝি দিদি? আপনারা দু'টিতে আছেন বেশ। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই—

কিম্বা ফেরার সময় উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙ্গে পড়তে পড়তে সিঁড়ি

দিয়ে উঠছে সুলতা, প্রায়ান্ধকার ঘর থেকে কেমন যেন অদ্ভুত নিস্পৃহ গলায় প্রশ্ন এসেছে : ফিরলেন এতক্ষণে, সিনেমায় গেছলেন বুঝি ? এরসঙ্গে স্বগত উক্তি পর্যন্ত শোনা যায় : কতদিন যে সিনেমায় যাইনি— আহা কতদিন ! তারপর নিঃশব্দ ঘর দোর। সিঁড়ি না পেরুন পর্যন্ত সুলতার কথা ফুটত না। সর্বক্ষণ মনে হয়েছে কারো নির্জীব চাউনি। দরজার কাছে হেলান দেওয়া অনেকদিনের চেনা ভঙ্গিটি পর্যন্ত। একতলার আবছা অন্ধকার বারান্দার ছায়া রহস্যময়, সিঁড়ির ধাপে ধাপে পুরু অন্ধকার, একটা ভ্যাপসা গন্ধে জড়ানো বাতাস। অস্বস্তিকর পরিবেশ।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছে অমিয়কান্তি : কি ব্যাপার, একেবারে চুপচাপ মেরে গেলে যে ?

কিন্তু যতক্ষণ না অমিয়কান্তির কাছ ঘেঁষে সিঁড়ি ভেঙ্গে একেবারে দোতলায় উঠে আসছে, নীচের সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের বিন্দুটি পর্যন্ত মিলিয়ে গেছে আর একটানা কান্নার মত সেলাই কলের অবিরাম আওয়াজ স্তিমিত না হয়েছে ততক্ষণ যে সহজ হতে পারেনি সুলতা। তারপর ওপরে পৌছে নিজেকে নিশ্চিন্ত মনে করে কথা বলল যেন সুলতা : আমার কেমন যেন ভারী বিশ্রী লাগে। সহ্য হয় না কিছুতেই—

বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকায় অমিয়কান্তি সুলতার দিকে। খুসীতে হাসিতে ডগ্‌মগ্‌ সুলতা ফেঁপে উঠেছে। ফেটে পড়তে চায়। যেন মুহূর্ত আগেকার ঘটনার কোন স্বীকৃতি নেই তার কাছে। ওপরে, দোতলায় পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে নীচের প্রায়ান্ধকার ঘরের রুগ্ন, নিরুত্তাপ ইতিহাস মুছে দিতে চেয়েছে মন থেকে।

তবুও মাঝে মধ্যে বিশু এলে ছলাৎ করে ওঠে বুকের ভেতরকার রক্তের স্রোত। কোথায় যেন একটা কঠিন পরিবর্তন মনে হয়েছে। বিশুর রুক্ষ চুলের গোছায় লাল আভা। ঘাড়ের কণ্ঠার হাড় সুস্পষ্ট।

মুখের সুকুমার লালিত্য নিঃশেষিত বহুদিন। শুধু নির্মল শান্ত চোখের উজ্জল আলাময়ী চাউনি।

শৈলবালা প্রশ্ন করেন: হ্যাঁরে, বিশু, শিশু খেয়েছে নাকিরে? আজ রান্না হতে কত দেরী তোদের?

চট্ করে উত্তর দিতে পারে না বা উত্তর দেয় না বিশু। চুপ করে থেকে এদিক ওদিক তাকায় নিশ্চুপ উদ্দেশ্যহীন—চোখের নীলাভ তারায় আশ্চর্য বিদ্যুতের. প্রস্তুতি। এক মিনিট চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে বলে: আজ ত রান্না বন্ধ—

তবু মাঝে মাঝে হাত পেতেছে সকাল সন্ধ্যায়। কখনো বা শীর্ণ মুখ আরো শীর্ণতর, অপরিষ্কার খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি মুখ। সকালে বিকেলে সাহায্য চেয়েছে ওপরে এসে: দেবেন স্যার কিছু, দয়া করুন। শীর্ণতর হাতটা চোখের সামনে এসে স্থির হতে চেষ্টা করে। পরে থরথর করে কাঁপতে থাকে: বেশী নয় মাত্র গোটা কুড়ি টাকা—না পেলে সপরিবারে মারা পড়ব।

বিরক্তিতে নাকের ডগা কুঁচকে আসে সুলতার।

ড্যাবড্যাবে ম্লান চোখ আর অসহায় চেহারা। হাত পাতে কিছু দিন: স্যার সাহায্য করুন—

কান্নায় উসখুস করেন শৈলবালা।

আর অমিয়কান্তির চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে।

কিন্তু কঠোর সুলতা নির্বিকার।

দু' একদিন বাদে সকালে গোলমালের মধ্যে যেন ঘুম ভেঙে গেছে সকলের। অমিয়কান্তির বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখল সুলতা কিন্তু অমিয়কান্তিকে দেখতে পেল না। অমিয়কান্তি তখন বাইরে

রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। নির্বিকার ভাবে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে আছে। লাল আর টানটান যেন সারাটা মুখ।

সুলতা তখন এগিয়ে এল অমিয়কান্তির কাছে। তারপর রেলিঙের ওপর দিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ল, ক'জনে মিলে নীচের সেলাই কলটা একটা লরীতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আর একটু দূরে নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে একগাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে সংগ্রামী মানুষটা। যেন কোন দায় নেই আর। ঋণ মুক্ত। রাস্তার ফুটপাতে কাঁদছে রোগা ক্যাকাশে বৌটা। মাথার ঘোমটা খুলে গেছে, আলুথালু কাপড় চোপড়, বিবর্ণ একগোছা চুল ভেঙে পড়েছে পিঠে।

আর সেলাই কলের ফ্রেমটা ধরে প্রাণপণে চ্যাচাচ্ছে বিশু আর শিশু। আর বলছে: এস ধর বাবা—তুমি একটু ধর। ওরা যে সব নিয়ে গেল বাবা—

বিকেল বেলা অফিস থেকে ফেরার সময়, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় একটু যেন থমকে দাঁড়াল অমিয়কান্তি। আবার সেই সেলাইকলের আওয়াজ। অবাক হল অমিয়কান্তি! তবে কি আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে কোন মতে। কৌতূহলী চোখে আধ ভেজানো পাল্লার মধ্য দিয়ে চাইতেই চমকে উঠল অমিয়কান্তি, কে একজন হাত মেসিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি একটা যেন সেলাই করছে। একটু দূরে খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা লোকটা বোকার মত কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে।

সেলাই ছেড়ে একবার উঠে দাঁড়াল সে। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া ঘাম মুছতে দেখে ভাবল অমিয়কান্তি কালকেই সুলুর চোখ দেখানো দরকার, চোখ খারাপ কথাটা মোটেই মিথ্যে নয় ওর।

———